ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1476-1493
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

বরাক উপত্যকার লোকশিল্প: একটি বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

মিশন কুমার রায়, *শিক্ষক, শিক্ষা বিকাশ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শ্রীভূমি, অসম, ভারত*

Received: 21.07.2025; Accepted: 29.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Barak valley is a diverse valley located in the southern part of Assam.The Valley is named Barak valley after the Barak River, which flows through it.The Barak valley comprises three Districts, Sribhumi(Karimganj),Cachar and Hailakandi. These three districts wrapped in lush greenery are surrounded by rivers forest and Small Hills.The Barak region is a diverse area, richly inhabited by Various communities and ethine group. Despite the Bengali majority in the Barak valley it is also the settlement ofmanipuri, mizo, chakma, and many other hill communities. The Barak valley is a confluence of multilingual and multicultural communities.In the Barak valley communities such as the Bengali, Manipuri and Tea-tribes engage in a wide range of crafts.In the Barak valley, different groups of people engage in distinct forms of folk arts.In this diverse. Barak valley people create various crafts for daily use and income generation. There is a variety of artistic diversity, such as kantha embroidery, Various bamboo crafts,clay furniture and different tools made from cane and wood. While many many people make these items for everyday needs, some earn their livelihood by selling them. The materials used in this folk art are easily accessible to people. Bamboo, cane, wood, clay etc, are the primary components of folk art, using these materials, people apply their sharp intellect to create various beautiful shapes and designs. The folk art of the Barak valley has become an appealing and widely used element in various places, both nationally and internationally.

Keywords: Barak Valley, Folk Art, Cultural Diversity, Bamboo, Cane Crafts, Ethnic Communities

আসামের দক্ষিণ প্রান্তে বরাক নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বরাক উপত্যকা শ্রীভূমি (করিমগঞ্জ), কাছাড়, হাইলাকান্দি এই তিনটি জেলা নিয়ে গঠিত। সবুজ শ্যামলীমা পূর্ণ এই তিনটি জেলা নদী, অরণ্য, ছোট-ছোট পর্বতে ঘেরা। বরাক নদীর তীরবর্তী অঞ্চল বলে এই অঞ্চলের নাম বরাক উপত্যকা। বরাক উপত্যকা বিভিন্ন জাতি-জনজাতিতে পরিপূর্ণ এক বৈচিত্র্যময় অঞ্চল। এই অঞ্চলে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও মনিপুরি, মিজো,চাকমা প্রভৃতি অনেক পাহাড়ি জাতির বাসস্থল। বরাক উপত্যকা বহুভাষিক ও বহু সাংস্কৃতিক মানুষের এক মিলনক্ষেত্র। বরাক উপত্যকার বাঙালি, মনিপুরি,চা-জনজাতি প্রভৃতি গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শিল্প সৃষ্টি রয়েছে। তাদের জীবন যাপনের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলোরও অনেক বৈচিত্র রয়েছে। মণিপুরি, বাঙালি, চা-জনজাতি প্রভৃতি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি নৈপুন্যতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প সৃষ্টিতে তাদের মেধা ও বুদ্ধির প্রখরতা লক্ষনীয়।

বরাক উপত্যকার বিভিন্ন লোকমানসে বিভিন্ন লোকশিল্পের প্রচলন আছে। বৈচিত্র্যময় এই বরাক উপত্যকায় মানুষ দৈনন্দিন ব্যবহার ও অর্থ উপার্জনের জন্য বিভিন্ন শিল্প সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ধরনের শিল্প বৈচিত্র রয়েছে।

যেমন- কাঁথা শিল্প, বাঁশের তৈরি নানান শিল্প, মাটির তৈরি আসবাবপত্র, কাঠ ও বেতের তৈরি নানা সরঞ্জাম। এগুলো যেমন মানুষ নিত্য প্রয়োজনে তৈরি করে তেমনি একাংশ মানুষ এগুলো বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এই লোকশিল্পের উপাদান গুলো মানুষের একদম হাতের কাছে পাওয়া সামগ্রী। বাঁশ, বেত, কাঠ, মাটি প্রভৃতি লোকশিল্পের প্রধান উপাদান। এগুলো দিয়েই মানুষেরা তাদের প্রখর বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন মনোরম আকৃতি প্রদান করে। বরাক উপত্যকার লোকশিল্পের নিদর্শন দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহৃত ও আকর্ষণীয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

লোকশিল্প কী ? লোকশিল্পের সংজ্ঞা:

শিল্প মানে সৃষ্টি অর্থাৎ শিল্প প্রকৃতির প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামাল থেকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্য সৃষ্টি করা। আমরা বলতে পারি প্রকৃতির প্রদত্ত সম্পদকে রূপগত ও অর্থগত পরিবর্তন এর মাধ্যমে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করাকেই শিল্প বলে। যেমন- মাটি থেকে ঘট কলসি হাড়ি ইত্যাদি। লোকশিল্প লোক মানসের সমষ্টিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা বা তার চিন্তা চেতনার একটি বিশেষ শৈলী। লোকশিল্প লোকজীবন ও সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। লোকশিল্পের মধ্যে একটি লোকসমাজের চিন্তা চেতনার আবাস পাওয়া যায়। শিল্পীরা তাদের মনন ও চিন্তন কে লোকশিল্পের মধ্যে প্রকাশ করেন। বৈচিত্রপূর্ণ বরাক উপত্যকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের লোকশিল্প আলাদা হয়। মনিপুরি, চাকমা, চা-জনজাতি প্রভৃতি জাতি থাকলেও বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ। মণিপুরি মানুষেরা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলোতে তাদের সৃষ্টিশীল মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। বরাক উপত্যকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিরা কখনো প্রয়োজনের তাগিদে আবার কখনো নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নানা শিল্প তৈরি করেন।

লোকশিল্প লোক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে তৈরি সমস্ত ধরনের চাক্ষুষ শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করে। লোকশিল্পের অনেক ধরনের সংজ্ঞা রয়েছে, তবে সাধারণত বস্তুগুলি কেবলমাত্র আলংকারিক হওয়ার পরিবর্তে কিছু ধরনের ব্যবহারিক উপযোগ থাকে। লোকশিল্পের নির্মাতারা সাধারণত সংস্কৃতির ললিতকলা ঐতিহ্যের পরিবর্তে একটি জনপ্রিয় ঐতিহ্যের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হয়ে থাকেন। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ যারা উন্নত সমাজ কাঠামোর মধ্যে বিরাজমান কিন্তু ভৌগোলিক অথবা সাংস্কৃতিক কারণে শিল্পের উন্নত ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাদের নির্মিত এ শিল্পকে লোকশিল্প রূপে বিবেচনা করা হয়। লোকশিল্প কোনো সমাজের মৌলিক সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। এই লোক শিল্পের মাধ্যমে একটি জাতির আচার-আচরণ মনোভাব প্রথা সম্পর্কে গভীরভাবে জানা যায়।

লোকশিল্পে একটি সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবনের শিকড় এবং জীবন ব্যবস্থা প্রতিফলিত হয়। তারা লোকশিল্প এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত সুস্পষ্ট সংস্কৃতির চিরায়ত রূপকে ধারণ করে। দৃশ্যমান লোকশিল্প একটি ঐতিহ্যগত সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহারের জন্য ঐতিহাসিকভাবে তৈরি করা বস্তুসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। অদৃশ্য লোকশিল্প সঙ্গীত, নাচ এবং আখ্যান কাঠামোর মতো শিল্পসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য উভয়ই গড়ে উঠেছিল তখনকার প্রয়োজন মিটানোর জন্য। যখনই এর বাস্তবিক উদ্দেশ্য শেষ হয়ে যায় বা হারিয়ে যায়, তবে এর প্রাথমিক উদ্দেশ্যে বা যে কারণে এটি সৃষ্টি হয়েছিল তা প্রয়োজনীয়তা ছাড়া সেটির রূপান্তরের কোন কারণ অবশিষ্ট থাকে না।

নকশা ছাঁচ লোকশিল্পকলার একটি স্থায়ী ফর্ম। মাটি, পাথর অথবা কাঠ দিয়ে বিভিন্ন ডিজাইনের ছাঁচ তৈরি করা হয়। এ ছাঁচে গলিত তামা কাঁসাকে ফেলে তামা কাঁসা'র শিল্প সৃষ্টি করা হয়।এ ছাঁচে ফেলে বস্তকে বিভিন্ন আকৃতিতে রূপদান করা হয়। কাঠের নকশা করা ছাঁচে রং লাগিয়ে কাপড়ও কাঁথা ছাপানো হয়। কাঠ, মাটি ও পাথরের ছাঁচে মিঠাই, ক্ষীর, আমসত্ব, গুড়ের পাটালি ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

বরাক উপত্যকার গ্রামে গ্রামে মাটির বাসনপত্র এককালে বেশ প্রচলিত ছিল। আজও অনেক গ্রাম্য কারিগর মাটির বাসন তৈরি করে, তবে আধুনিকতার প্রভাবে কিছু কমে গেছে। তৈরি করে বিচিত্র ধরনের তৈজসপত্র। এমনকি আজকাল অতি আধুনিক গৃহসজ্জার সামগ্রী হিসেবে মাটির ঘড়া, থালা, ফুলদানি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।পোড়ামাটির কাজের ঐতিহ্য এ দেশে বহু যুগের। মাটির কলস, হাঁড়ি, পাতিল, ফুলদানি, দইয়ের ভাঁড়, সন্দেশ ও পিঠার ছাঁচ, টেপা পুতুল ইত্যাদি তৈরি করতে দেখা যায় বরাকের কুমারদের। আধুনিক রুচির ফুলদানি, কলমদানি, চায়ের সেট,

কৌটা বা ঘর সাজাবার নানা ধরনের শৌখিন সামগ্রী সব কিছুই মাটি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া পুরাকালের মসজিদ বা মন্দিরের সাথে যেসব নকশাদার ইট দেখা যায় তা এদেশের লোকশিল্পের এক অতুলনীয় নিদর্শন।

করিমগঞ্জ জেলার কালিগঞ্জ অঞ্চলের মাদুর এবং শীতলপাটি বরাক উপত্যকার সকলের কাছে পরিচিত। গ্রীষ্মকালে ব্যবহারে আরামদায়ক বলেই নয়, শীতলপাটির নকশা একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। অতীতে শীতলপাটির বহু দক্ষ কারিগর ছিল। আমাদের গ্রামের ঘরে ঘরে যে শিকা, হাতপাখা, ফুলপিঠা তৈরি করা হয়, তা মোটেই অবহেলার জিনিস নয়। সাধারণ সামগ্রী হলেও যারা এগুলো তৈরি করেন তাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রকাশ ঘটে এসব জিনিসের মধ্যে।

বাঁশের নানা রকম ব্যবহার ছাড়া আমাদের জীবন চলতেই পারে না। ছোটোখাটো সামান্য হাতিয়ারের সাহায্যে আমাদের কারিগররা বাঁশ দিয়ে আজকাল আধুনিক রুচির নানা ব্যবহারিক সামগ্রী তৈরি করছে যা শুধু আমাদের নিজেদের দেশেই নয়, বিদেশেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া শোলাশিল্পের উৎকৃষ্ট সৃজনশীল নমুনা দেখা যায় পুতুল, টোপর ইত্যাদির মধ্যে। শিল্পীরা শোলা দিয়ে অসাধারণ দক্ষতার সহিত আকর্ষণীয় শিল্প সৃষ্টি করেন।

কাপড়ের পুতুল তৈরি করা আমাদের দেশের মেয়েদের একটি সহজাত শিল্পগুণ। অনেকাংশে এসব পুতুল প্রতীকধর্মী। এগুলো যেমন আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি বিদেশি পয়সা ও উপার্জন করে। বরাক উপত্যকার একটি অন্যতম নৃত্য পুতুল নাচ। পুতুল নাচে শিল্পীরা অনেক কারুকার্য পূর্ণ পুতুল তৈরি করে। পুতুল তৈরিতে মেয়েদের অনেক ভূমিকা রয়েছে। পুরনো কাপড় দিয়ে সুতো পেচিয়ে পেচিয়ে পুতুল তৈরি করে। কাপড়ের মধ্যে পুতুলের নাক কান চোখ তৈরি করে। বৈশাখ সংক্রান্তির দিন পুতুল বাসানোর প্রথা প্রচলন আছে। বৈশাখ সংক্রান্তির দিন মেয়েরা কাপড় দিয়ে কন্যা বানিয়ে জলে ভাসিয়ে দেয়। লোক বিশ্বাস আছে পুতুল যদি না বসানো হয় তবে ওই বানানো পুতুল সর্পরূপ ধারণ করে ওই পরিবারের লোকদের দংশন করে।

লোকশিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব আমাদের সকলের। বরাক উপত্যকার বিভিন্ন শহর এবং গ্রামের হাজার হাজার নারী-পুরুষ আছে, যারা কাজ করতে চায় অথচ কাজের অভাবে দিন দিন দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে। সুপরিকল্পিত উপায়ে এবং সুরুচিপূর্ণ লোকশিল্প প্রস্তুতির দিকে মনোযোগ দিলে তাদের সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে। আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে পুরাতন সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে। সকলের সহযোগিতায় ও মনোনিবেশে লোকশিল্পকে টিকিয়ে রাখা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা রাখছি।

লোকশিল্প: পরিচিতি প্রসঙ্গ (লোকশিল্পের বর্গীকরণ):

সকল দেশের লোকসংস্কৃতির মত আমাদের বরাক উপত্যকায়ও লোকসংস্কৃতি নির্মিত ও রূপলাভ করেছে এদেশের প্রকৃতি-পরিবেশে মানুষের জীবনযাপনকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য-সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহের সমন্বয়ে। সাংস্কৃতিক উপাদান সংস্কৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি একক বা মাত্রা হিসেবে কাজ করে। সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের মিলনে ও সমন্বয়ে যে সাংস্কৃতিক অবস্থা, পরিবেশ, অবয়ব সৃষ্টি হয়, অনুরূপভাবে বরাক উপত্যকার সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের মিলনে ও সমন্বয়ে আবহমানকাল ধরে যে সাংস্কৃতিক অবস্থা, পরিবেশ, অবয়ব গড়ে উঠেছে, তা এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনধারার, জীবনযাপনের। এই জীবন ধারা আবহমান বাংলাদেশের গ্রামীণ লোকজীবনধারা, বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো হচ্ছে কোন বস্তু: লাঙ্গল, খালুই, ঢেঁকি, কুলা, মৃৎপাত্র, বস্ত্র, কাস্তে, নকশী কাঁথা, নৌকা, ঝুড়ি, পাটি, জীবনযাপন পদ্ধতি সংক্রান্ত: কাপড় বোনা, নকশীকাঁথার সেলাই করা, ঝুড়ি বোনা, পাটি তৈরি করা, নৌকা ও গরুরগাড়ী বানানো, মৃৎপাত্র তৈরি করা, চিত্র অংকন; লোকজ বিশ্বাস ধর্মীয় ও লোকজ আচার-আচরণসমূহ: মৌখিক, বাচনিক লোকসংগীত, লোক সাহিত্য; শারীরিক, আত্মরক্ষামূলক শারীরিক অঙ্গভঙ্গী, খেলাধুলা নৃত্য, অনুষ্ঠান, আনন্দ-লোকজ উৎসব, মেলা ইত্যাদি।

আমাদের হাতের কাছে পাওয়া সামগ্রীগুলোই লোকশিল্পের উপাদান। যেমন- বাঁশ-বেত,কাঠ, পাঠ, মাটি ইত্যাদি। এই উপাদানগুলো দিয়ে শিল্পী শিল্প সৃষ্টি করেন। লোকশিল্প কে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

(১) চিত্র

(২) ভাস্কর্য
(৩) স্থাপত্য

কিন্তু উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বারা বর্তমান সময়ে লোকশিল্পকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

(১) অংকন ও নক্সা
(২) সূচিকর্ম
(৩) বয়নশিল্প
(৪) আর্দর্শায়ন
(৫) ভাস্করণ
(৬) স্থাপত্য

(১) অংকন ও নক্সা: অঙ্কন ও নকশা জাতীয় শিল্পকর্ম বরাক উপত্যকায় খুব প্রচলিত। বরাক উপত্যকার গ্রাম শহর সব জায়গায় নকশা তৈরি করতে দেখা যায়। এই আলপনা হাতের কাছে পাওয়া দ্রব্য দিয়েই তৈরি করা যায়। পুজো, বিয়ে, মহানাম সংকীর্তন ইত্যাদি সব ধরনের শুভ কার্যে অঙ্কন করার প্রচলন দেখা যায়। লোকমানসের চিন্তা দ্বারা আলপনার মধ্যে প্রকাশিত হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস ও অর্থের প্রয়োজনে মানুষ অংকন ও নকশা করে থাকে। অংকন ও নকশাকে বিভিন্ন ভাগে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা যায়।

(ক) আলপনা
(খ) পট চিত্র
(গ) পিঁড়ি চিত্র
(ঘ) শরা চিত্র
(ঙ) ঘট চিত্র
(চ) পুতুল চিত্র

অংকন ও নকশাধর্মী এই শিল্পগুলো বিশ্লেষণ করে দেখব এগুলোর শিল্পীরা কিভাবে তাদের মনন ও চিন্তন থেকে প্রকাশ করেন।

(ক) আলপনা: আলপনা বরাক উপত্যকার একটি অন্যতম লোকাচার বলা যায়। বরাক উপত্যকা তথা সমস্ত বাংলার ঘরে ঘরে বিশেষ কোন দিনে আলপনা করা হয়। বাঙালি হিন্দুরা সব রকমের শুভ কাজে আলপনা ব্যবহার করেন। বিশেষ করে দুর্গাপূজার নবমী ও লক্ষী পূজার দিনে আলপনা দেওয়া হয়। নবমীর দিন দেবী দুর্গাকে আহবান জানাতে আলপনা করা হয়। লক্ষ্মী পূজার দিনে অস্থির চঞ্চলা দেবী লক্ষীকে গৃহস্থরা ঘরে স্থির করে রাখতে গৃহাভিমুখ করে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন অঙ্কন করেন। আমরা জানি দেবী লক্ষী কোনোদিন কারো ঘরে বেশি থাকেন না। মানুষ দু'দিন ধনী দু'দিন গরিব থাকে। লোক বিশ্বাস আছে যদি গৃহাভিমুখ করে লক্ষীর পদচিহ্ন করা হয় তাহলে গৃহস্থের বাড়িতে সচরাচর লক্ষীর আগমন ঘটবে।

অগ্রহায়ণ মাসে ধান তোলা শেষ করে কৃষক পত্নীরা বাড়িতে আলপনা করে। আলপনাতে অঙ্কন করা হয় ধানের ছড়া, কৃষি কাজে ব্যবহৃত সমস্ত সামগ্রীগুলোর চিত্র। অংকন করা হয় গরুর পদচিহ্ন, কাস্তে, কুলো, ডালা, চালুনি, ফুল, হুজা, বাঙ ইত্যাদি। আলপনাতে ব্যবহৃত হয় চালের গুড়ি। পুজো পার্বন বা লোকবিশ্বাস ছাড়া যে সমস্ত আলপনা করা হয় সেগুলো বিভিন্ন ধরনের রং দিয়ে করা হয়। লোকবিশ্বাস আছে গৃহস্থ যদি আলপনাতে পুকুর ও মাছের ছবি অংকন করেন তাহলে গৃহস্থের পুকুর হবে। পুকুরে বেশি মাছের উৎপাদন হবে।

এছাড়াও বিয়ের কুঞ্জ সাজাতে কুঞ্জের ভিতর আকর্ষণীয় আলপনা তৈরি করা হয়। কুঞ্জের ভিতরে বিভিন্ন রঙের আবির চুমকি ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের নকশা তৈরি করা হয়। বিষ্ণু পূজা, গণেশ পূজা, মনসা পূজা, সরস্বতী পূজা ইত্যাদি পূজাতে ঘটের নীচে আবির বা চালের গুড়া দিয়ে ফুলের ছবি অঙ্কন করা হয়। অন্নপ্রাশন, মহানাম সংকীর্তন, যজ্ঞকুণ্ড এই সমস্ত শুভ কাজে আলপনার ব্যবহার অপরিহার্য।

(খ) পট চিত্র: পট চিত্র হলো বড় কাপড়ে কোন কাহিনীর ছবি অঙ্কন করা। আগেকার দিনে পটচিত্রের প্রচলন ছিল। বরাক উপত্যকাসহ সমস্ত বাংলায় পটচিত্র সঙ্গে নিয়ে দরিদ্র গায়েনরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে অর্থ উপার্জন করত।

ফটো চিত্রে অঙ্কন করা হতো বিভিন্ন দেবদেবীর কাহিনী। জানা যায় আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে শরৎকালে করিমগঞ্জ, কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলার গ্রামে গ্রামে এক শ্রেণীর লোককে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত, যাদের পেশা ছিল ছবি দেখানো। যে কোন রকম ছবিকেই সাধারণ ভাবে বলা হ'ত পট; কিন্তু এই ছবিগুলি ছিল একটু বিশেষ ধরণের। এগুলি চওড়ায় হত দেড় হাত পৌণে দু'হাত আর লম্বায় আট দশ হাত বা তারও বেশী; আর অধিকাংশ পটেরই শেষদিকে নরকপুরীতে যমরাজের সভা আর পাপী লোকদের শাস্তিবিধানের নানারকম ছবি থাকতো। এইজন্য ছবিগুলিকে বলতো যমপট বা যাদুপট; আর যারা পট দেখাতো তাদের বলা হ'ত যাদুপটুয়া!

আগে বরাক উপত্যকায় প্রায় সর্বত্র এই পটুয়া বা পোটোদের দেখা গেলেও এখন আর তাদের বংশধরদের খুঁজে পাওয়া যায় না। সহকর্মী অন্যান্য জাতের অনেক কারুশিল্পীদের মত এরাও জাতিগত পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যুক্ত হয়ছে। পটুয়াদের ছবিতে যে সব কাহিনী বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের জীবনলীলাই তারমধ্যে প্রধান। একথা বললে কিছু অত্যুক্তি হবে না যে এই দুই মহাপুরুষের দুই লোকোত্তর চরিত্র ও জীবন কথা যুগে যুগে ভারতবর্ষীয় সমাজকে যেভাবে অনুপ্রাণিত ক'রেছে তার হুবহু তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণের জীবন-লীলার মধ্যে তাঁর অলৌকিক জন্মকথা, তাঁর গোচারণ ও অসুর- দলন সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা পটগুলিতে বেশী পাওয়া যায়, যেমন রামায়ণেরমধ্য রাম-বনবাস, জটাযুবধ, লঙ্কাযুদ্ধ- এইগুলি ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। পটে আর যে সব আখ্যায়িকা পাওয়া যায়, জনপ্রিয়তার দিক থেকে বেহুলা আর লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী সেগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য। আর্দ্রবাতাস, জল ও জঙ্গলাকীর্ণ জমি, মানুষের কুটিলতম শত্রু সর্পকূলের নিবাস ও বংশবৃদ্ধির পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। মানুষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক বিভিন্ন দেশের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। মানুষ নানা দুর্দান্ত হিংস্র জন্তুকে আপন, বুদ্ধি ও কৌশলে নির্বীর্য্য করেছে, জয় করেছে। কিন্তু হিংস্র, খল স্বভাব সর্পকূল বহুকাল পর্যন্ত মানুষের মনে গভীর ভয় মিশ্রিত রহস্যের উদ্রেক করেছে।

র্সপকূলের উপদ্রব দুর্নিবার্য্য হয়ে উঠেছিল এক সময়। সেই সময়ে সমাজের সঙ্গে সর্পকুলের ঘোর- দ্বন্দ্বের পর সর্পেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল। এই পরাজয়েরই চিহ্ন দেখি মনসাদেবীর পরিকল্পনা ও পূজার প্রচলনে, চাঁদসওদাগর ও বেহুলার কাহিনীতে। বাঙালী আপনার কল্পনা দিয়ে চাঁদ ও মনসার কাহিনীকে অপূর্ব কাব্য ও ভাবরসের সামগ্রী করে তুলেছিল। মধ্যযুগের গীতিকাব্য মনসামঙ্গলে এবং বেহুলার পটগুলিতে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব সাজানো গৃহে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, পুত্রহীনা নারীর বিলাপ; পুরুষের চরিত্রে পিতার স্নেহ ও মানসিক দৃঢ়তার দ্বন্দ্ব, নব-পরিণীতা বধূর স্বামীভক্তি ইত্যাদির অপূর্ব বর্ণনা মাধুর্য্য চাঁদবেনে ও বেহুলার কাহিনীকে বাঙালী সমাজে এক অপূর্ব উপভোগের সামগ্রী করে তুলেছিল। আর এই কাহিনীর আশ্রয়ে ভক্তির দ্বারা প্রকৃতির অনিবার্য্য শক্তিকে বশ করবার যে প্রয়াস দেখা যায় আমাদের এই বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও তার তুলনা পাওয়া যায় না। এই ভাব ও ভক্তি রসাত্মক কাব্যকাহিনী নিয়ে শিল্পীরা রঙ ও রেখা দিয়ে যে আলেখ্য রচনা করত শিল্পবস্তু হিসাবে সেগুলিও অতুলনীয়।

মনসা-মঙ্গলের মত দেবীমাহাত্ম্য প্রচারে কমলে কামিনীর কাহিনীও বাঙলার লোকসাহিত্যের অন্যতম সম্পদ এবং মনসামঙ্গলের মত এই কাহিনীও পটুয়াদের আলেখ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই ছবিগুলিতে ধনপতি সওদাগরের বাণিজ্য উপলক্ষ্যে সিংহলে যাওয়া, সাগরে কমলে কামিনী দর্শন, সিংহলপতির দেবী দর্শনের প্রয়াস ও অক্ষমতা, ধনপতির কারাবাদ, পিতার অনুসন্ধানে। পুত্রের আগমন, দেবীর মাহাত্ম্য ও পূজার প্রচার। পটুয়া স্বকীয় উপকরণে অধিকতর উজ্জ্বলভাবে মানুষের মনে এঁকে দিতে সক্ষম হয়েছিল তার ছবির মারফৎ । ছবি দেখিয়ে দেখিয়ে গান গেয়ে পটুয়ারা মানুষকে সন্তুষ্ট করে যে টাকা উপার্জন করত তা দিয়ে তাদের সংসার চলত।

(গ) পিঁড়ি চিত্র ও শরা চিত্র: শুভ কার্যে ব্যবহৃত কুড়ি ও শরাতে নানা চিত্র অঙ্কন করা হতো। বিয়েতে ও শুভ অনুষ্ঠানে পিড়ি ও শরাচিত্রের প্রচলন দেখা যেত।

(ঘ) ঘট চিত্র ও পুতুল চিত্র: ঘট চিত্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটচিত্র হল অন্নপ্রাশন, বিয়ে, মহানাম সংকীর্তন ও মহানাম যজ্ঞ জলভরার ঘট। এই ঘটগুলোতে বিভিন্ন ধরনের চিত্র দেখা যায়। বিশেষ করে মনসা পূজার ঘটে অনেক চিত্র দেখা যায়। শ্রাবণ মাসে শ্রাবণী পূজা প্রধানত ঘট দিয়ে করা হয়। ঘটের মধ্যে নাগ ফট ধরে থাকে। আর ঘটের মধ্যে পদ্মফুল অথবা অন্য কোনো ফুলের ছবি দেখা যায়। বরাক উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় আগে পুতুল নাচ দেখা

যেত। বিভিন্ন কারুকার্যে পুতুলকে সাজিয়ে নাচ দেখানো হতো। তা থেকে শিল্পীরা অর্থ উপার্জন করত। বৈশাখ সংক্রান্তির দিনে মেয়েরা কাপড় দিয়ে পুতুল বানিয়ে জলে ভাসিয়ে দেয়। তাতেও পুতুল নানা চিত্রে বিচিত্রে আকর্ষণীয় করে তুলে।

(২) সূচিকর্ম: বরাক উপত্যকার লোকশিল্প গুলোর মধ্যে অন্যতম রূপ শিল্প হল সূচি কর্ম। এই সূচি কর্ম বরাক উপত্যকার প্রতিটি গৃহ তথা সমস্ত বাংলায় দেখা যায়। অবসর সময়ে অথবা প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের মা বোনেরা সূচি কর্ম করে থাকেন। সূচি কর্ম লোক শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এই সূচি কর্মে নানান ধরনের হয়। নানান ধরনের নকশা ফুল পাখি ইত্যাদি আকৃতি তৈরি করা হয় সূচিকর্মে। বরাক উপত্যকায় প্রচলিত কয়েকটি সূচি কর্ম যেমন- কাঁথা, টেবিল কভার, রুমাল, চাঁদুয়া দেবদেবীর ছবি, পাখি, ফুল ইত্যাদি তৈরি করা। এই লোকশিল্প গুলো খুবই আকর্ষণীয় হয়। নানা ডিজাইনে তৈরি করা হয় এই সূচি কর্ম।

সূচি কর্মের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কাঁথা সেলাই। এই কাথাতে অনেক ধরনের কারুকার্য করা হয়। কাঁথা বিভিন্ন ধরনের হয়। ছোট বাচ্চা জন্মের পর একপ্রকার কাঁথা। বাচ্চা কিছু বড় হওয়ার পরে আরেকরকম কাঁথা। বড় মানুষের ব্যবহৃত আরেক ধরনের কাঁথা। শীতকালে গায়ে দেওয়ার কাঁথা। গরমকালে গায়ে দেওয়ার পাতলা কাঁথা শীত ও গরম মধ্যবর্তী সময়ে গায়ে দেয়ার কাঁথা।

কাঁথা তৈরি করতে যে উপাদানগুলোর প্রয়োজন হয় সেগুলো একদম হাতের কাছে পাওয়া জিনিস। কাঁথা তৈরি করতে লাগে বাড়ির পুরনো সুতির কাপড়। কয়েকটা সুতি কাপড় কাতার নির্দিষ্ট মাপে রেখে সেলাই করে কাঁথা তৈরি করতে হয়। কাটা তৈরি সুতো ঘরের পুরনো কাপড়ের কামা থেকে বের করা সুতা। কাঁথা সিলাই করতে নানা কারুকার্য করা হয়। কারুকার্যের মাধ্যমে কাঁথা আকর্ষণীয় হয়।

কাঁথা ছাড়া রুমাল টেবিল কাবার ও চাঁদুয়া তৈরিতে সূচি কর্ম করা হয়। কোথাও কোথাও দেখা যায় প্রেমিকা প্রিয়জনের নাম সূচি দিয়ে কাপড়ের মধ্যে লিখে রাখে। পরিষ্কার কাপড়ের মধ্যে সূচি কর্মের দ্বারা পাখি বা ফুলের ছবি তৈরি করা হয় রুমালে। রুমাল তৈরি করতে প্রয়োজন হয় রঙ্গিন সুতার।

এছাড়াও দেবদেবীর পূজায় বা শুভকার্যে উপরে চাঁদুয়া লাগানো হয়। বিশেষত বরাক উপত্যকার মনসা পূজা, দুর্গা পূজা, লক্ষী পূজা, বিষ্ণু পূজা ইত্যাদিতে চাঁদুয়ার প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ। কাপড়ের উপরে নানান নকশা তৈরি করে তৈরি করা হয়।

এছাড়াও রুমাল পান দানি ঠাকুরের আসনে কাপড় ইত্যাদিতে সূচের দ্বারা নানা আকৃতি তৈরি করা হয়।কাঁথা , টেবিল কবির, রুমাল, চাঁদুয়া ইত্যাদি।বরাক উপত্যকার সূচি কর্ম একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সূচি দিয়ে নানা নকশা তৈরি করে, সূচি কর্ম করা হয়। রুমাল, পাখা, চাঁদুয়া, টেবিল কবার প্রভৃতির সৌন্দর্য খুবই আকর্ষণীয়।

(৩) বয়নশিল্প: যে শিল্প বয়ন বা বাইন করে সৃষ্টি করা হয় তাকে বয়নশিল্প বলে। বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলার কালিগঞ্জ অঞ্চলটি শীতল পাটির জন্য বিখ্যাত। বিভিন্ন প্রকার বয়ন শিল্প যেমন পাটি, নকশী পাখা, ঝুড়ি,বেতের তৈরি ফুল,আয়নার ফ্রেম, ফুলের সাজি, পটাঙ্গি, টুকরি, বেড়া, ডাম, দাড়িয়া ইত্যাদি। এছাড়াও মণিপুরিদের মধ্যে রয়েছে গামছা বয়নের নানা কারুকার্য। বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলার কালিগঞ্জ অঞ্চল বয়ন শিল্পের জন্য বিখ্যাত। কালিগঞ্জের শিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের পাটি তৈরি করেন। শীতল পাটি, নকশী পাটি, চাটি ইত্যাদি তৈরিতে কালিগঞ্জের নাম সমস্ত বরাক তথা বরাকের বাইরে ছড়িয়ে আছে।

(৪) আদর্শায়ন: লোক শিল্পের অন্যতম আদর্শায়ন। আদর্শায়ন হলো দেবদেবীর মূর্তি বা মাটি দিয়ে তৈরি কোন মূর্তি। বরাক উপত্যকার হিন্দু সমাজে প্রচলিত নানা পূজা পার্বণ দেব দেবীর মূর্তি না ছাড়া সম্ভব হয় না। দুর্গা, শিব, মনসা, বিষ্ণু, গনেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মী এরকম অনেক দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করা হয়। দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণে বরাক উপত্যকায় বিভিন্ন শিল্পালয় রয়েছে। করিমগঞ্জের বিখ্যাত কয়েকটি শিল্পালয় হল প্রতিমা, শিল্পালয় রূপ শিল্পালয়। কাছার হাইলাকান্দিতেও অনেক বিখ্যাত শিল্পালয় রয়েছে। শিল্পীরা দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করতে প্রথমে বাঁশ দিয়ে স্ট্রাকচার তৈরি করেন। তারপর খড় দিয়ে মূর্তির কাল্পনিক অবয়ব প্রদান করেন। তারপর মাটিকে প্রক্রিয়াজাত করে মাটি লেপন করেন। বিভিন্ন ডিজাইনের দ্বারা প্রতিমাকে জীবন্ত করে তোলেন। অত্যাধিক সুন্দর ও মনোরম হয় প্রতিমা। প্রতিমার শাড়ি, অলংকার, মুকুট সবকিছুই মাটি দিয়ে তৈরি করা যায়। বর্তমানে আধুনিকতার

প্রভাবে আধুনিক মনোভাবাপন্ন লোকশিল্পীদের প্রতিমা নির্মাণেও আধুনিকতা দেখা যায়। সঞ্জয় রায় ও রাজীব বিশ্বাসের সংবাদ থেকে জানা যায়, বর্তমানে মূর্তি তৈরি করতে আধুনিক যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করা যায়।

(৫) ভাস্কর্য: ভাস্কর্য পাথর বা গুহাতে খোদাই করে তৈরি চিত্র বা মূর্তি। ভাস্কর্য হলো মানুষের তৈরি মন্দির বা মসজিদের গায়ে খোদাই করা বিভিন্ন কারুকার্য, গুহাচিত্র, নকশা ইত্যাদি। যেমন- অজন্তা ইলোরা গুহাচিত্র ।

(৬) স্থাপত্য: লোক সাহিত্য, লোকশিল্প, লোক সংস্কার প্রভৃতি শব্দের প্রাচীনত্ব কতটুকু তা বলা দুস্কর হ'লেও নৃতত্ত্ববিদরা মোটামুটি এর একটি গ্রহনযোগ্য সময়কাল নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দী কিংবা তার কিছু পূর্বে। কিন্তু স্থাপত্য Folk অথবা vernacular architecture প্রবচনটির উদ্ভব খুবই সাম্প্রতিক। বস্তুতঃ যে রীতি-পদ্ধতি ও মাল-মসলার সাহয্যে গ্রামীণ বাড়ী ঘর তৈরী তা আদৌ স্থাপত্যের পর্যায়ে পড়ে কিনা তা অবশ্যই তর্কের বিষয়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী স্থপতি কাদা-মাটি, ছন, বাঁশ, গোল-পাতা, খড়-কুটো দিয়ে তৈরী বসত বাড়ীকে স্থাপত্য কীর্তি বলতে অবশ্যই কুণ্ঠিত হবেন, কারণ তাঁদের মতে স্থাপত্যের দু'টি পূর্বশর্ত রয়েছে একটি unity এবং অপরটি beauty। ঘর কেবল মাত্র বসবাস অথবা অন্য কোন প্রয়োজন মিটালেই এছাড়াও রয়েছে আর এক সমস্যা, টিকে থাকার সমস্যা। তাদের ভাষায়, যে সমস্ত ইমারত, স্থায়ী উপকরণ, অর্থাৎ পোড়া ইট, পাথর, মার্বেল দিয়ে তৈরী নয় সেগুলিকে স্থাপত্যের পর্যায়ে পড়ে না।

সভ্যতার ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে যে, মানুষ প্রাকৃতিক গুহা থেকে সমতলে এসে বসবাস করার সময় নানারূপ বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়। নব্য প্রস্তর যুগে মানুষ যখন চাষবাস করতে শুরু করে তখন সমতলে বসবাস অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তখন কোন উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে বাঁশ বা কাঠের গুড়ি পুঁতে তার উপর লম্বালম্বী চালা তৈরী করে বসবাস শুরু করে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই সমস্ত ঘর বাড়ী ধ্বংস হতে থাকলে প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা সমতলে কাঠের গুড়ি ভালভাবে গোল করে পুতে বেষ্টনী তৈরী করে তারপর অগ্রভাগ শক্র দড়িদিয়ে বেঁধে চারি পাশে পাতার ছোট ডাল ও কাদামটি (thatch) নিয়ে water proof করে ঢালু ছাদ তৈরী করে। এ ধরনের গৃহ, যা আজও আফ্রিকার উপজাতীয়দের মধ্যে প্রচলন রয়েছে, তা প্রকৃত পক্ষেই আদিম লোক- স্থাপত্য। এই লোক স্থাপত্য দেশ, কাল, পাত্র ভেদে বিভিন্ন ধরণের আকৃতি ও নক্শীতে রূপান্তরিত হয়, যেমন নব্য প্রস্তর যুগের সুইজারল্যাণ্ডে হ্রদের উপর কাঠের খুঁটির উপর ভিত্তিকরে নির্মিত ঘর বাড়ী। আশ্চর্য্যের বিষয়, বর্তমানে জংগলাকীর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রামও, উপজাতীয়দের এই ধরণের গৃহের প্রচলন আছে।

বরাক উপত্যকার কয়েকটি স্থাপত্য শিল্প হল কাঁচা কান্তি মন্দির, সিদ্ধেশ্বর কপিলাশ্রম ইত্যাদি। স্কুল কলেজ পুরনো মোট মন্দির ইত্যাদি।

বরাক উপত্যকার বাঁশ শিল্প:

বরাক উপত্যকা তথা বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্প বাঁশ বেতের শিল্প। বাঁশ তৃণ জাতীয় এক প্রকার শক্ত সরল দীর্ঘ উদ্ভিদ। খাল-বিল, নদী-নালা, ও ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা বরাক উপত্যকার উর্বর মাটিতে অনেক জায়গায় নানা প্রজাতির বাঁশ পাওয়া যায়। গ্রাম নির্ভর বরাক উপত্যকায় বাশেঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের 'নমঃশূদ্র' সম্প্রদায়ের মানুষেরা বাঁশ দিয়ে নানা সামগ্রী তৈরি করে। বাঁশের তৈরি সামগ্রীগুলো বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। বরাক উপত্যকাতে বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ পাওয়া যায়। যেমন- মিরতিঙ্গা, মুলি, ডলু, বেথু, ঝাঁই, বরুয়া, বাঁশকাল,কালিগদা ইত্যাদি। এই বাঁশগুলো প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করা হয়। মানব জীবনে বাঁশের ভূমিকা অপরিহার্য। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবসময়ই বাঁশের প্রয়োজন। প্রাচীন কালে বাঁশের ঢালা (পিঠ) দিয়ে নাড়িচ্ছেদ করা হতো। মৃত্যু পরে অন্তিম যাত্রায় বাঁশ দিয়ে খেউর তৈরি করা হয়। বরাক উপত্যকার লোকশিল্পের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে বাঁশ। বাঁশের ঘর, বাঁশের বেড়া, বাঁশের মণ্ডপ, বাঁশের খুঁটি, বাঁশের লাঠি, বাঁশের বাঁশী, বাঁশের নানা শিল্পে পরিপূর্ণ বাঙালির ঘর-দোর। এছাড়াও রয়েছে নিত্য ব্যবহৃত সামগ্রী, বাঁশের কুলা, ঝুড়ি, চালুনি, পুতুল,মোড়া, চেয়ার-টেবিল, খেলনা প্রভৃতি বাঁশের নানা শিল্প প্রাত্যহিক জীবনের নানা প্রয়োজন পূরণ করেছে।

এছাড়াও সমগ্র বরাক উপত্যকায় মাছ ধরার ক্ষেত্রে রয়েছে, ডরী, ফারঙ্গ, রুঙ্গা, ডু, ম'ইনা, চেপা, গুই, পলো ইত্যাদি। প্রয়োজন অতিরিক্ত সৌন্দর্য বাঁশের শিল্পকাজে মুগ্ধতা এনে দেয়। নানা সংস্কার-বিশ্বাস পূজা পার্বণে বাঁশ

নানা প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়। পূজা অনুষ্ঠান এবং গৃহপ্রবেশের সময়ও বাঁশের ব্যবহার করা হয়। পূজোতে বাঁশ দিয়ে ধ্বজা তৈরি করা হয়। বিয়েতে নানা কারুকার্যে খচিত বাঁশের কুঞ্জ তৈরি করা হয়।

বাঁশের তৈরি সামগ্রীগুলো কে নানা ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

(১) গৃহস্থালির সরঞ্জাম
(২) কৃষিকাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম
(৩) মৎস্য শিকারে ব্যবহৃত সরঞ্জাম ও
(৪) অন্যান্য সরঞ্জাম।

(১) গৃহস্থালির সরঞ্জাম: মানুষের নিত্যদিনের ব্যবহৃত সামগ্রীগুলো বেশিরভাগ বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়। বাঁশের তৈরি সামগ্রীগুলো নানা নকশা দ্বারা আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির উন্নতির ফলে প্লাস্টিক, স্টিল অ্যালুমিনিয়াম, ইত্যাদির আবিষ্কারের ফলে বাশেঁর সামগ্রীর ব্যবহার কমে গেছে। আগেকার দিনে মানুষ ঘুমানোর বিছানা থেকে শুরু করে আলনা, চেয়ার, টেবিল, পালঙ্ক, আয়নার ফ্রেম, রেক, কলমদানি, ফুলদানি, ফুলের সাজি, কুলো, ডালা, চালনী,পটাঙ্গি ইত্যাদি সবকিছু তৈরি করতো। বরাক উপত্যকার 'নমঃশূদ্র' বা 'ডোম' সম্প্রদায়ের লোকেরা বাঁশ শিল্পের উত্তরাধিকার বহন করে থাকেন। ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নীচে গৃহস্থালির ব্যবহৃত বাঁশের তৈরি শিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

(ক) বিছানা: দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ যারা কাঠের তৈরি পালঙ্ক কিনতে পারেনা তারা বাঁশ দিয়ে বিছানা তৈরি করে। এই বিছানা আবার নানা কারুকার্যে সুন্দর করে তৈরি করা হয়। বিছানা তৈরি করতে বেতু বা বাশঁকাল বাশেঁর প্রয়োজন হয়। বাঁশকে পালঙ্কের মাপ অনুযায়ী কেটে আঁশ ফেলে দেয়। পরে বাঁশকে রোদে শুকিয়ে পালঙ্ক তৈরি করা হয়। ৪/৫ হাত লম্বা বাশের টুকরো গুলোকে একসাথে সমান্তরালভাবে রেখে বাঁধা হয়। ২/৩ হাত লম্বা বাঁশের চারটি কোটি মাটিতে গেড়ে তারপরে বাঁশগুলোকে সমান্তরালভাবে রেখে বাঁধা হয়।

(খ) চেয়ার: বাঁশের চেয়ার তৈরি করতে হলে বেঁথু বাঁশের প্রয়োজন হয়। ছোট বেঁথু কে নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী কেটে চেয়ারের আকৃতি তৈরি করা হয়। এতে ভিন্ন মাপের বাঁশের প্রয়োজন হয়।

(গ) ব্রেঞ্চ: কোন বাড়িতে বা দোকানে বাঁশের তৈরি ব্রেঞ্চ দেখা যায়। ব্রেঞ্চ তৈরি করতে খাঙ, বেঁথু, মুলি ইত্যাদি যেকোনো বাঁশ দিয়ে তৈরি করা যায়। দু-তিন হাত লম্বা চার টুকরো বাঁশ মাটিতে গেড়ে তার উপর পাঁচ-ছয় হাত লম্বা বাঁশ সমান্তরাল ভাবে রেখে বাঁধা হয়।তখন বাঁশগুলো ব্রেঞ্চের আকার ধারণ করে।

(ঘ) আলনা: মানুষ আগেকার দিনে কাপড় রাখার জন্য বাঁশ দিয়ে আলনা তৈরি করত। আলনা তৈরি করতে বেঁথু ও মিরতিঙ্গা বাঁশের প্রয়োজন হয়। কাজল রায়ের সাক্ষাৎকার থেকে জানতে পারি ৪/৫ হাত উচ্ছতার বেঁথু বাঁশের টুকরো মাটিতে গেড়ে, তার মধ্যে নিজের পছন্দের ডিজাইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট মাপে মিরতিঙ্গা বাঁশের টুকরো ঢুকানো হয়।

(ঙ) রেক: বাড়িতে জিনিসপত্র রাখতে রেকের প্রয়োজন হয়। কাঠের রেক তৈরি করতে অসমর্থ মানুষ বা বাঁশের তৈরি জিনিসপত্র তৈরি করতে বিশেষ আগ্রহী মানুষের বাড়িতে বাঁশের তৈরি রেক দেখা যায়। রান্না ঘরে ব্যবহৃত বাঁশের রেকে শাক-সব্জি, চাল-ডালের পাত্র, বাসন ইত্যাদি রাখা যায়। এছাড়াও বই থেকে শুরু করে মেয়েদের সাজার জিনিসপত্র সবকিছু রাখা যায়। ক্ষেত্র অনুসন্ধান অনুযায়ী মানুষের মুখ থেকে শুনা তথ্য থেকে জানা যায় রেক তৈরি করতে বিভিন্ন ধরনের বাঁশের প্রয়োজন হয়। গৃহস্থলীর ব্যবহৃত সব বাঁশ শিল্পগুলোতে বেঁথু বাঁশের প্রয়োজন পড়ে। রেকের আকৃতি অনুযায়ী বাঁশের টুকরো কাটতে হয়। প্রথমে দুই-আড়াই হাত মাপের বাঁশের টুকরো কাটতে হয়। তারপর এগুলোতে দৈর্ঘ্য দুই হাতের মতো বাঁশের টুকরো জোড়া দিতে হয়। তারপর স্টেপ অনুযায়ী ছোট ছোট বাঁশের টুকরো কেটে বিভিন্ন নকশা বাড়িতে জিনিসপত্র প্রয়োজনর রেক তৈরি করা হয়। শিল্পীর শিল্পকৌশলে বাঁশের তৈরি রেকগুলো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

(চ) আয়নার ফ্রেম: বাঁশশিল্প শুধু দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাকে না। বিশেষ সৌখিন মানুষের বিনোদনের সময়ে নতুন চিন্তাধারায় নতুন নতুন বাঁশ শিল্প তৈরি হয়। বিশেষ সৌখিন বা সাংস্কৃতিক পরিবারে বাঁশের তৈরি আয়নার ফ্রেম দেখা যায়। বাঁশের ফ্রেমযুক্ত আয়না বিশেষত বিভিন্ন মেলায় পাওয়া যায়। যেমন বদরপুরের

বারুণী মেলা, করিমগঞ্জের নেতাজি মেলা, পৌষ সংক্রান্তিতে পীন্নঘরে পৌষ সংক্রান্তি মেলা, হাইলাকান্দিতে আনন্দ মেলা, পৌষ মেলা, রবীন্দ্র মেলা, দীঘলবাকে পৌষ সংক্রান্তি মেলা। ক্ষেত্র সমীক্ষা অনুযায়ী জানা যায় আয়নার ফ্রেম তৈরি করতে ছোট ছোট বাঁশের টুকরো নানা ডিজাইন করে কেটে, পরে বয়ন করে এগুলো তৈরি করা হয়। তারপর বিভিন্ন ধরনের রং, চুমকি লাগিয়ে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। বাঁশের ফ্রেমযুক্ত আয়না বাজারে বেশি মূল্যে বিক্রি হয়।

(ছ) কলমদানি: বাঁশের তৈরি কলমদানি কলম রাখতে ব্যবহৃত হয়। ছোট বাঁশের টুকরোর আঁশ ফেলে ছোট ছোট বেঁথ বের করে বয়ন করা হয়। কলমদানি বিভিন্ন ডিজাইনে তৈরি করা হয়। রং করে কলম দানি বিশেষ আকর্ষণীয় হয় ও টেবিলের শোভা বর্ধন করে। কলমদানি বিভিন্ন মেলায় বিক্রি হতে দেখা যায়।

(জ) ফুলদানি: বিনোদনের জন্য বা সৌন্দর্যের জন্য বাঁশ শিল্প আকর্ষণীয় হয়। সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে ঘরে টেবিলের উপরে ফুলদানি রাখা হয়। বাঁশের তৈরি ফুলদানি খুব আকর্ষণীয় হয়। ফুলদানি কলমদানির মতো বাঁশকে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা হয়। ফুলদানি বিভিন্ন মেলায় বিক্রি হতে দেখা যায়।

(ঝ) ফুলের সাজি: ফুলের সাজি বিশেষত ফুল তুলতে ব্যবহৃত হয়। ফুলের সাজি বিভিন্ন রকম তৈরি করা যায়। নিত্য দিনের পূজায় বা বিশেষ পূজা পার্বণে ফুলের সাজি দিয়ে ফুল তোলা হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়। বাঁশ থেকে বেথ বের করে তারপর বয়ন করে ফুলের সাজি তৈরি করা হয়।

(ঞ) কুলা: কুলা বাঁশের তৈরি অন্যতম একটি বিশেষ সামগ্রী। ঘরে চাল বা ধান থেকে তুষ আলাদা করতে ব্যবহৃত হয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কুলা কবি প্রয়োজনীয়। কুলা বাঁশের তৈরি হলেও কিন্তু সবটা বাঁশের নয়। কুলাতে বাঁশের বুনন শেষ হলে বেত দিয়ে কুলার চারপাশের বুনন কার্য করা হয়। তাতে কুলা শক্তপোক্ত এবং টেকসই হয়। ডোম বা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের শিল্পীরা কুলো তৈরি করেন। কুলার বাতাস দিয়ে চালের তুষ উড়িয়ে চাল বের করা হয়। বরাক উপত্যকা তথা সমগ্র বাংলা ও বাংলা সাহিত্যে কুলার ব্যবহার আছে।'কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করা' এসব প্রবাদ জীবন্ত। সৃজ্যমান বাংলা সাহিত্য কে বাংলা সাহিত্য কে শক্তি দিয়েছে এমন প্রবাদ। বরাক উপত্যকার কুলাকে নিয়ে অনেক রীতি বা স্ত্রীআচার আছে। লক্ষী পূজা এবং নবান্ন উৎসবে কুলাকে সুচিস্নাত করে মঙ্গল সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হতো। বিবাহেও কুলা ব্যবহৃত হয়। গুরুসদয় দত্ত তার 'বাংলা রসকলা প্রতিভা' প্রবন্ধে লিখেছেন– বিবাহ ইত্যাদি পর্বে বরণ-কুলা ব্যবহারের প্রথা বাংলার পল্লী জীবনে একটি অতি মনোরম জিনিস, যদিও আমাদের দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রথাটি আজকাল প্রায় লোপ পেতে বসেছে। এই তুচ্ছ বাঁশের তৈরি বরণ কুলাগুলিকে বাংলার পল্লীর মেয়েদের অসাধারণ কলা প্রতিবাদে কি অপরূপ সৌন্দর্যের আধার করে তোলে তা বাস্তবিকই একটি বিস্ময়ের জিনিস। মেয়েরা কুলের ভিতরের দিকটায় সাদা কাপড় লাগিয়ে তাতে মাটির একটা পাতলা আস্তরণ দিয়ে তার উপর চিত্র এঁকে থাকেন। বরাক উপত্যকায় হিন্দু বিবাহের সময়ে কুলার উপর খৈ রেখে সামাজিক রীতিনীতি পালন করা হয়। নববধুর মা, ভাই বা ব্রাহ্মণ কুলার উপর খৈ রাখেন। কুলা বাঙালি পরিবারে গৃহস্থালি ও কৃষিকার্যে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ একটি সামগ্রী।

ক্ষেত্র অনুসন্ধান করতে গিয়ে বাবুলাল রায় ও সুজিত রায়ের সাক্ষাৎকার থেকে কুলা তৈরীর পদ্ধতি জানা যায়। কুলা তৈরি করতে বেঁথু, খাঙ, কালিগদা ইত্যাদি বাঁশের প্রয়োজন হয়। এক হাত অথবা দেড় হাত লম্বা বাঁশের টুকরা কেটে। তারপর তা থেকে আঁশ ফেলে দিতে হয়। এই বাঁশের টুকরোগুলো থেকে বেত করতে হয়। তারপর বুনন করে কুলা তৈরি করা হয়।

চতুর্ভুজাকৃতি কুলার দুটো দিকে কোন তুলতে হয়। আর সামনের দুটো দিক বিপরীত দিকে তুলনায় একটু ছোট হয়। তারপর এগুলোতে একটি বড় বাঁশের টুকরো দিয়ে চাক লাগাতে হয়। এই চাকটি সুতো দিয়ে বেঁধে মজবুত করা হয়। তারপর গরুর গোবর দিয়ে লেপন করা হয়। যাতে কোনো পোকা কুলা নষ্ট করতে পারে না বা টেকসই হয়। কুলা যদি বেঁথু বাঁশ দিয়ে বানানো হয় তাহলে বেশি মজবুত হয় ও বাজারে বেশি দামে বিক্রি হয়। জয়দীপ দাসের কাছ থেকে জানা যায় বাঁশ অনুযায়ী কুলার দাম কম বেশি হয়। তবে কুলা তৈরি করতে একটি লোকবিশ্বাস আছে। সধবা নারীরা কুলা তৈরি করেন না। বিধবা নারী অথবা পুরুষ কুলা তৈরি করেন। মহিলা মারা গেলে মৃত্যুর পর শ্মশানে কলস, ঘটি, কুলা ইত্যাদি দেওয়া হয়।

(ট) চালুনি: চালুনি বরাক উপত্যকার গৃহস্থ পরিবারে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ একটি সামগ্রী। ডোম অথবা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের শিল্পীরা বাঁশ চেঁছে তার থেকে বেত বের করে, চতুষ্কোণ ঘর সদৃশ ছোট ছোট ফাঁক রেখে চালু তৈরি করেন। চালুনি গোলাকার হয়। বাঁশ দিয়ে চালুনি নির্মাণ পদ্ধতির মূল ভিত্তি হল চতুষ্কোণ নকসা। নানা লোকজ পদ্ধতিতে হাতের চাপে চাল, মুড়ি থেকে তুষ এবং ধুলো মুক্তো করার উপযোগী করে কুলো তৈরি করেন শিল্পীরা। বাঁশের চালুনি বিভিন্ন রকম হয় যেমন, চালের চালুনি, আঁটা চালুনি,সুজি চালুনি। আঁটা ও সুজির চালুনির ফাঁক খুব ছোট হয় সুজির দানার মতো। বাজারে চালুনি দাম বিভিন্ন রকম হয়। চালুনি অনুযায়ী তার দাম বিভিন্ন রকম ১০০/২০০/৩০০ এরকম হয়।

(ঠ) ডালা: ডালা বাঁশ দিয়ে তৈরি অন্যতম একটি সামগ্রী। গ্রাম শহর সব জায়গাতেই প্রত্যেক পরিবারে ডালার ব্যবহার আছে। চাল, মরিচ, শুটকি, আমসত্ত্ব প্রবৃত্তি শুকাতে ব্যবহৃত হয়। ডালা কৃষি কাজেও ব্যবহৃত হয়। কুলার মত ডালা দিয়েও ধানের কাটা সরানো হয়। বরাক উপত্যকার, করিমগঞ্জ জেলার ইছাবিল অঞ্চলের মানুষেরা ডালা দিয়ে দানের কাটা সরায়। ডালা ধান তোলার সময় বাজারে বেশি পরিমাণে বিক্রি হয়। ডালা তৈরি করতে প্রথমে বাঁশ থেকে আঁশ ফেলে তারপর বয়ন করে তৈরি করা হয়। ডালা গোলাকার হয়। সেজন্য ডালাতে গোল চাকের প্রয়োজন হয়। বয়ন করার পর চাকের সঙ্গে সুতো দিয়ে ভালো করে বেঁধে দেয়া হয়। ঢালা তৈরির পর গোবরের লেপন করা হয়।

গৃহকার্য কৃষিকার্য ছাড়াও ঢালা ব্যবহৃত হয় বিয়ে অন্নপ্রাশন ইত্যাদি শুভ অনুষ্ঠানে। বিয়ের সময় ডালাতে রঙের দ্বারা সাজিয়ে নানান দ্রব্যাদি রাখা হয়। এছাড়াও কোন অনুষ্ঠানে বা পূজোর প্যান্ডেলে ছোট বড় ডালা দিয়ে সাজানো হয়। কখনো ডালার উপর স্টিকার বা কাগজের ছবি লাগিয়ে দেয়ালে লাগানো হয়। মহিলাদের মৃত্যুর পর শ্মশানেও ডালা কুলা কলসি প্রভৃতি দেয়া হয়। ডালা বরাক উপত্যকা তথা সমগ্র বাংলাদেশে মানুষের সঙ্গে ও ওতোপ্রতভাবে ভাবে জড়িয়ে আছে।

(ড) পটাঙ্গি: প্লাস্টিকের পাত্র বের হওয়ার আগে বরাক উপত্যকার প্রতিটি ঘরে পটাঙ্গি ব্যবহৃত হতো। পটাঙ্গি বাঁশ দিয়ে তৈরি একটি আকর্ষণীয় সামগ্রী। লোকশিল্পের বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে পটাঙ্গি অন্যতম প্রয়োজনীয় সামগ্রী। পটাঙ্গি তৈরি করতে মিরতিঙ্গা, বেঁথু ইত্যাদি বাঁশের প্রয়োজন হয়। নির্দিষ্ট মাপে বাঁশ কেটে তার থেকে বেত বের করে বয়ন করে পটাঙ্গি তৈরি করা হয়। পটাঙ্গি তৈরি করতে বাঁশের বেতকে নমনীয় করতে হয়। পটাংগি তলা, পাশ, ওপরের মোড়া বাঁধুনি বুনন এর বৈচিত্র। নীচ থেকে বয়ন করে ধীরে ধীরে উপরের দিকে তুলতে হয়। পটাঙ্গির তলদেশ চতুষ্কোণ উপরের অংশ ধীরে ধীরে গোলাকার করে তোলা হয়। বাঁশ টুকরো করে চেঁছে নমনীয় করে বিভিন্ন ডিজাইনের টুকরি তৈরি করেন লোকশিল্পীরা। পটাঙ্গির নকশা চমৎকার সৌন্দর্যের দ্যোতক। প্রকারের ভিন্নতা ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার সূত্রে শিল্পীরা লাভ করেন। বিশেষত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই পটাঙ্গি তৈরি করে।

(ঢ) টুকরি, ঝাড়ু, ঝুড়ি, ডাম: গৃহস্থ পরিবারে ব্যবহৃত অন্যতম বাঁশের সামগ্রী হল টুকরি, ঝাড়ু, ডাম। ধান, চাল, ইত্যাদি যে কোন কিছু রাখতে টুকরি ব্যাবহার করতে হয়। চুপড়ি বাঁশের তৈরি এক অপরূপ শিল্প। টুকরির তলা, পাশ, ওপরের মোড়া, বাঁধুনি, বুননের বৈচিত্র। প্রকারের ভিন্নতা ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার সূত্রে শিল্পীরা লাভ করেন। টুকরির তলদেশ চতুষ্কোণ উপরের অংশ ধীরে ধীরে গোলাকার করে তোলা হয়। বাঁশ টুকরো করে ছেছে নমনীয় করে বিভিন্ন ডিজাইনের টুকরি তৈরি করেন লোকো শিল্পীরা। টুকরির নকশা চমৎকার সৌন্দর্যের দ্যোতক। ঝাড়ু দেওয়ার জন্য বাঁশের শলা বের করে ঝাড়ু তৈরি করা হয়। ঝুড়ি জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। প্রাচীনকাল থেকে এই শিল্প সমগ্র বরাক উপত্যকা তথা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। ডাম-ধান, মরিচ ইত্যাদি শুকোতে ব্যবহৃত হয়। নেটের জাল আবিষ্কার হওয়ার আগে প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়িতেই ডামের ব্যবহার ছিল।

(২) কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত সরঞ্জাম: বরাক উপত্যকায় কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলো অনেকটাই বাঁশের। কৃষি নির্ভর বরাক উপত্যকায় কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয় জোয়াল, জ্যাক, মই, মই কাঠি, ছাতা, উকওইত, হুজা, বাঙ্গ, সেউতি, হুফা ইত্যাদি। এছাড়াও কাস্তে, কোদাল ইত্যাদির ব্যাট বাঁশ দিয়ে বানানো হয়। বরাক উপত্যকায় কৃষি ক্ষেত্রে বাঁশের গুরুত্ব অপরিসীম। বাঁশের তৈরি সামগ্রীগুলো কৃষি কাজে বিরাট ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে এসমস্ত লোকশিল্প কম দেখা যায় না। মেশিন, ট্রাক্টর ইত্যাদি আবিষ্কারের

ফলে গ্রামাঞ্চলে গরুর হাল মহিষের হাল ইত্যাদি দেখা খুবই মুশকিল। আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের আগে কৃষি কাজে বাঁশ ও কাঠের সামগ্রী দিয়েই কৃষিকাজ সম্পন্ন করা হতো। গ্রামীণ শিল্পীরা তাদের চিন্তা চেতনার মধ্যে সুদক্ষ শিল্পীর পরিচয় দিতেন। নিরক্ষর চাষিরা নিজের মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়ে বাঁশ দিয়ে জলসিঞ্চলের জন্য সেউতি। মাটিকে গুড়া ও সমান করতে মই তৈরি করত। এই শিল্প গুলো তৈরি করতে একজন শিল্পীর অনেক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষি কাজের সঙ্গে অপরিচিত শহরের কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি লাঙ্গল, জোয়াল, মই ইত্যাদি তৈরি করতে পারবে না। গ্রামের লোকশিল্পীরা তাদের মেধা ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার দ্বারা নতুন ধরনের শিল্প সৃষ্টি করেন।

কৃষিকাজে ব্যবহৃত সামগ্রীগুলো আলোচনা করে দেখব সেগুলোর সৃষ্টি ও কার্যকারিতা কিভাবে মানব জীবনকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

(ক) জোয়াল: জোয়াল কৃষিকাজে ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী। জোয়াল গরু অথবা মহিষের কাঁধে বসিয়ে তারপর জলের সঙ্গে লাঙ্গলের ঈশ লাগিয়ে হাল চাষ করা হয়। জোয়াল না ছাড়া দুটো গরু অথবা মহিষ দিয়ে হাল চাষ করা সম্ভব নয়। হাল চাষ করতে ব্যবহৃত প্রধান সামগ্রিক গুলোর মধ্যে অন্যতম সামগ্রী জোয়াল।

করিমগঞ্জ জেলার সুপ্রাকান্দি অঞ্চলের বাসিন্দা সুব্রত রায়ের সংবাদ থেকে জানা যায় জোয়াল তৈরীর বিবরণ। জোয়াল তৈরি করতে বেঁথু/ ঝাঁই/ বরুয়া ইত্যাদি যেকোনো একপ্রকার বাঁশের প্রয়োজন হয়। তিন হাত অথবা সাড়ে তিন হাত মাপে বাঁশ কেটে, তারপর আঁশ ফেলে রোদে শুকিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। যাতে দুটি গরু অথবা মহিষ একসাথে যুগ্ম হতে পারেনা সেজন্য জোয়ালে দেড় হাত/একহাত লম্বা বাঁশ/ সুপারি গাছের টুকরো/ কাঠের ছোট্ট টুকরা ঢুকানো হয়। তারপর যাতে লাঙ্গলের ঈশ ঠিক মাঝখানে থাকে সেজন্য জোয়ালের টিক মাঝখানে ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা আঙ্গুল পরিমাণ ছোট বাঁশের টুকরো ঢুকানো হয়।

জোয়াল তৈরি করতে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয় যাতে গরুর অথবা মহিষের কাঁধ ফেটে না যায়। গরু ও মহিষ যেভাবে কম দুঃখ পায় সেই নিয়মেই জোয়াল তৈরি করা হয়।

(খ) জ্যাক: বরাক উপত্যকায় একটি মহিষ দিয়ে হাল চাষ করতে জ্যাক ব্যবহার করতে দেখা যায়। জ্যাক বরুয়া বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়। প্রথমে বাঁশ কেটে তারপর আগুনে গরম করে বাঁকা করতে হয়। এই বাকা বাঁশ দুটো একসঙ্গে মহিষের কাঁধে লাগানো অংশতে এক টুকরো বাঁকা গাছের ডালের সঙ্গে বাধা হয়। আর শেষের অংশতে লাঙ্গল লাগিয়ে হাল চাষ করা হয়।

(গ) মই: কৃষিকাজে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান সামগ্রীগুলোর মধ্যে অন্যতম সামগ্রী হচ্ছে মই। মই কৃষিকাজে ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী। মই দিয়ে মাটিকে সমান ও উর্বর করা হয়। মই দুই প্রকার হয়। দু'পাঠি মই ও ত্রি'পাঠি মই।

দু'পাঠি মই তৈরি করতে চার হাত লম্বা ঝাঁই বাঁশ কাটতে হয়। তারপর বাঁশের টুকরো রোদে শুকিয়ে প্রক্রিয়াজাত করতে হয়। চার হাত লম্বা দু টুকরো বাঁশের টুকরো সমান্তরাল ভাবে রেখে তার মধ্যে চার টুকরো দের হাত লম্বা বাঁশের টুকরো ঢুকানো হয়। তারপর তার অথবা রশি দিয়ে বাঁধা হয়। যাতে জোড়াগুলো ছুটে না যায়। দু'পাঠি মই বেশিরভাগ বেশি কাদামাটির জমিতে দেওয়া হয়। দু'পাঠি মই এমনভাবে তৈরি করা যাতে চাষ করা জমির মাটি সমান হয় এবং শস্য ভালো হয়।

ত্রি'পাঠি মই মই দু'পাঠি মই থেকে একটু ভালো ও মজবুত। ত্রি'পাঠি মই টানতে শক্তিশালী গরুর প্রয়োজন হয়। ত্রিপাঠি মই মাটিকে খুব ভালোভাবে সমান করে। সবজির চারা রোপনের সময় চাষ করা জমিতে ত্রি'পাঠী মই টানা হয়। ত্রিপাঠি মই তৈরি করতে চার হাত লম্বা তিন টুকরো বাঁশের প্রয়োজন হয়। তারপর তিন টুকরো, চার হাত লম্বা বাঁশ সমান্তরালভাবে রেখে তার মধ্যে মধ্যে দেড় হাত লম্বা চার টুকরো বাঁশ ঢুকানো হয়। তারপর তার অথবা রশি দিয়ে বাঁধা হয় যাতে জোড়া খুলে না যায়। ত্রিপাঠি মই এমনভাবে মাটিকে প্রস্তুত করে যাতে কৃষকের সবজির চারা রোপন করতে সুবিধা হয় এবং জমিতে ভালো উৎপাদন হয়।

(ঘ) মই কাঠি, ছাতা, উকওইত, হুফা: কৃষিকাজে ব্যবহৃত সামগ্রী গুলোর মধ্যে অন্যতম সামগ্রী হল মই কাঠি, ছাতা, উকওইত, হুফা। মই টানার সময় মই জোয়ালের সঙ্গে সংযোগ করতে মইকাঠির প্রয়োজন হয়। মইকাঠি বাঁশের

কঞ্চি দিয়ে বানানো হয়। রোদ বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেতে কৃষকরা ছাতার ব্যবহার করেন। ছাতা ছাতার পাতা নামে এক ধরনের পাতা দিয়ে তৈরি। তবে ছাতা তৈরি করতে বাঁশের প্রয়োজন হয়। বাঁশ থেকে বেঁথ বের করে বুনন করে ছাতা তৈরি করা হয়। উকওইত ধান মাড়াই এর সময় ব্যবহৃত হয়। মাড়াই মেশিন আবিষ্কারের আগে গরু অথবা মহিষ দিয়ে ধান মাড়াই করা হতো। গরু ও মহিষ দিয়ে মাড়ায় করার সময় নীচের ধানের ছড়া উপরে তুলতে ও উপরের চড়া নীচে রাখতে উকওইত ব্যবহার করা হয়। ধান মাড়াই এর ক্ষেত্রে উকওতের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। হাল চাষ করতে বা মাড়াই করতে গরু বা মহিষ যাতে ঘাসে মুখ না দেয় সেজন্য গরুর মুখে হুফা লাগাতে হয়। হুফা তৈরি করতে বাঁশ থেকে বেত বের করে বয়োন করে করতে হয়। এগুলো ছাড়াও কৃষি কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী যেমন সেউতি বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়। বাঁশের বেত বুনন করে সেওতি তৈরি করা হয়।

(৩) মৎস্য শিকারে ব্যবহৃত সরঞ্জাম:

বরাক উপত্যকায় মৎস্য শিকারে ব্যবহৃত বেশিরভাগ সামগ্রী বাঁশ বেতের তৈরি। মৎস্য শিকারের সামগ্রীগুলোতে শিল্পীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। লোকশিল্পীরা তাদের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার জোরে এমন এমন শিল্প সৃষ্টি করেন যা আকর্ষণীয়। মৎস্য শিকারীরা বাঁশ দিয়ে তৈরি করেন অসাধারণ অস্ত্র। ডরি, পারঙ, চেপা, গুই, রুঙ্গা, ডু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মৎস্য শিকারি ব্যবহৃত সামগ্রী বিশেষ কৌশলে তৈরি করা হয়। যাতে মাছ একবার ভেতরে ঢুকলে আর বেরোনোর পথ না পায়। বাঁশের শলা বের করে লাইলন সুতা দিয়ে সেলাই করে তৈরি করা হয়। এই সামগ্রীগুলো সমাজের একাংশ শ্রেণীর মানুষ বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেন। অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন।

মৎস্য শিকারে ব্যবহৃত সামগ্রীগুলো একবারে সাধারণ মনে হলেও তাতে রয়েছে অনেক বুদ্ধি ও চিন্তা। সর্বপ্রথম যে শিল্পী এই হাতিয়ার গুলো তৈরি করেন উনার বুদ্ধির সীমা পরিসীমা নেই। যন্ত্রপাতি আবিষ্কার এর আগে নিরক্ষর লোকশিল্পীরা এই ধরনের শিল্প তাদের তীক্ষ্ণ মেধা দিয়ে তৈরি করে ছিলেন। বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রসার ঘটলেও মৎস্য শিকারে বাঁশের সামগ্রী গুলোর কদর রয়েছে।

মৎস্য শিকারে ব্যবহৃত সামগ্রীগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক কিভাবে তৈরি করা হয়।

(ক) ডরি: ডরি মৎস্য শিকারে ব্যবহৃত একটি প্রধান হাতিয়ার। ডরি ছোট মাছের জন্য বানানো হয়। ডরি তৈরি করতে এমন কৌশল ব্যবহার করা হয়। যাতে ছোট মাছ একবার ঢুকলে আর বেরোতে পারে না। ডরি বাজারে বিক্রি করে একাংশ মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। ক্ষেত্র অনুসন্ধান থেকে জানা যায় ডরি ২০০ টাকা থেকে শুরু করে হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। ডরি ছোট বড় বিভিন্ন রকমের হয়। কাজল রায়ের সংবাদ থেকে জানা যায়। ডরি কাঁটাফার ও লাগপার ইত্যাদি দু'ধরনের হয়। ডরি ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের হয়। ডরির আকৃতি অনুযায়ী তার দাম নির্ণয় করা হয়।

ডরি তৈরি করতে বেঁথু, খাঙ, কালিগদা ইত্যাদি যে কোনো প্রকার বাঁশ হলে হয়। তবে বেঁথু বাঁশের তৈরি ডরি টেকসই হয়। প্রথমে বাঁশকে কেটে মাপ অনুযায়ী ছোট ছোট শলা বের করা হয়। তারপর এগুলো বেত দিয়ে সেলাই করতে হয়। তারপর বাঁশের গোলাকার চাঁক বানিয়ে ডরি চাকে তোলা হয়। তারপর মাছ ঢুকার জন্য ফার তৈরি করা হয়। নীচে অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত ডরির ছবি ও তার অংশ গুলো চিহ্নিত করে দেওয়া হল।

(খ) পারঙ, চেপা, গুই: মাছ শিকারে ব্যবহৃত অন্যতম সামগ্রী হল পারঙ, চেপা, গুই ইত্যাদি। বাঁশ দিয়ে তৈরি এই সামগ্রীগুলোতে নানান ধরনের মাছ ঢুকে। কই, মাগুর, চেঙ, শোল প্রভৃতি মাছ এই সামগ্রীগুলোতে ঢুকে। বরাক উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে এই সামগ্রী বিভিন্ন আকৃতি হয়। লোকশিল্পীরা শিল্পগুলো আকর্ষণীয় করে তৈরি করেন। পারঙ ছোট ছোট শলা দিয়ে তৈরি করা হয়। প্রথমে বাঁশ থেকে শলা বের করতে হয়। তারপর বেঁথ দিয়ে সেলাই করা হয়। তারপর চাক লাগানো হয়। মাছ ঢোকার জন্য সর্বশেষে ফার লাগানো হয়। চেপাও অন্যতম মাছ শিকারের ফাঁদ। চেপাতে দুদিকেই মাছ ঢুকে। চেপার দুদিক চেপা থাকে। জানা যায় চেপা বাজারে ৩০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা দামে পর্যন্ত বিক্রি হয়। গুই ডরির মতো মাছ শিকারের একপ্রকার সামগ্রী। গুইতে পোনা মাছ ঢুকে। গুই তৈরিতে পারঙ থেকে একটু বড় শলার প্রয়োজন হয়। গুই তৈরি করতে আগে সেলাই করতে হয় না। প্রথমে ই চাকের সঙ্গে ঘাততে হয়। তারপর মাছ ঢোকার ফার তৈরি করা হয়। মৎস্য শিকারের সামগ্রীগুলো খুব আকর্ষণীয় হয়।

(গ) জুটি বা ডু: জুটি বা ডু বড় মাছ শিকারের অন্যতম হাতিয়ার। জুটি কম জলে ও বেশি জলে পাতানোর জন্য ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের জুটি হয়। জুটি তৈরি করতে প্রথমে গুঁই থেকে একটু বড় শলা বের করতে হয়। যাতে বড় মাছ জুটি ভেঙে পালাতে না পারে।

(৪) অন্যান্য সরঞ্জাম: কৃষিকার্য, মৎস্য শিকার, গৃহস্থালির সামগ্রী ছাড়াও অন্যান্য অনেক সামগ্রী রয়েছে যা বাঁশ দিয়ে তৈরি। নানান সামগ্রী বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয় যা অনেক মনোরম আকর্ষণীয়। বাঁশি বাঁশের তৈরি চমৎকার লোকশিল্প। কৃষ্ণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ বংশীবাদক তার হাতে থাকতো বাঁশের বাঁশি। কৃষ্ণের বাঁশিতে তাকে সাতটি ছিদ্র। উপত্যকায় বিভিন্ন রকমের বাসি তৈরি করতে দেখা যায়। এছাড়াও রয়েছে লাঠি, নড়ি। লাঠি বাঙালির এক অভিজাত শিল্পকলা, গৌরবেরও বটে। লাঠি বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়। বাঁশের লাঠিতে কোনো ব্যক্তি নানান কারু কার্য করে থাকেন। বরাক উপত্যকার বৃদ্ধ মানুষেরা এখনো লাঠি হাতে নিয়ে ঘোরাফেরা করেন।

বরাক উপত্যকার শিল্পকলায় বাঁশ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ একটি শিল্প। বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে লোকশিল্প কম দেখা যায়। বৃত্তিজীবী শিল্পী মানুষের হাতের স্পর্শে বানানো সাধারণ উপাদানের শিল্প গুলো আজ আর খুব নেই। সহজ সরল মানুষের চিন্তা চেতনা থেকে উঠে আসা নৃত্য প্রয়োজনে ও সামগ্রীগুলো খুব আকর্ষণীয় ছিল। দরিদ্রতা কাটাতে, জীবিকা নির্বাহ করতে অথবা গৃহের শোভাবর্ধন লোকশিল্পীরা বাঁশের তৈরি শিল্প সৃষ্টি করতেন। এই বাঁশের তৈরি শিল্পতে প্রয়োজন ছিলনা টাকার বিনিময়ে কেনা কোন উপাদান। হাতের কাছে পাওয়া বাঁশ-বেতে দিয়ে তারা নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টি করত। প্রাচীনকালের এই শিল্প গুলোর ধারণা থেকেই আধুনিক শিল্প গুলো সৃষ্টি হয়েছে। বরাক উপত্যকার বাঁশ শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে আমাদের সকলের বাঁশ শিল্প বিষয়ে অবগত হওয়া প্রয়োজন।

বরাক উপত্যকার মৃৎশিল্প:

নদীমাতৃক বরাক উপত্যকা। বরাক উপত্যকাতে প্রবাহিত হয়েছে বরাক নদী, জাটিঙ্গা নদী, লঙ্গাই নদী, কাঁকড়া নদী, মধুরানদী, কাটাখাল, ধলেশ্বর প্রভৃতি নদী।এই বরাক উপত্যকা নিম্ন এবং উর্বরা। পলিমাটি কাদামাটির দেশ আমাদের মাতৃভূমি। এই মাটিই মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান। মাটি শুকিয়ে পুড়িয়ে শিল্প সৃষ্টি হয়। মাটির শিল্প, মৃৎশিল্প। এই শিল্পে জড়িয়ে আছে ঐতিহ্য। মাটির সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয়। আর এই মাটির শিল্প বাংলা ও বাঙালির একান্ত আপনার শিল্প। বাঙালির গৃহকোণকে আলোকিত করে এই মাটির শিল্প। আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজন- সৌন্দর্যের মেলবন্ধন ঘটেছে বাংলার অপরূপ এই শিল্পকলায়। আমাদের দৈনন্দিন ঘর গৃহস্থালী নানা উপকরণ মাটির তৈরি। বাঙালির আচার অনুষ্ঠান, প্রথা, রীতি-নীতি, মঙ্গলসূচক শুভ কর্ম জড়িয়ে রয়েছে বাংলার নিজস্ব এই শিল্পকলায়। এককথায়, বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সারাৎসার মৃৎশিল্প। কালজয়ী এই শিল্পের স্রষ্টারা হলেন কুমোর। কুমোরেরা মাটির তৈজসপত্র তৈরি করেন। তৈরি করেন হাঁড়ি, কলসী ও বিভিন্ন গৃহস্থালী আসবাব। এছাড়াও মাটি দিয়ে পুতুল তৈরি করেন এদেরই এক সম্প্রদায়। এছাড়া ভিন্ন এক শ্রেণীর শিল্প শ্রমিকেরা তৈরি করেন ইট। কাঁচা ইট পুড়িয়ে ঘরবাড়ী, প্রাচীর, মন্দির, দেওয়াল তৈরি হয়। বাংলার পোড়ামাটির শিল্প বা টেরাকোটার শিল্প তো জগৎ বিখ্যাত। সিন্ধু সভ্যতার কালে, বেদের যুগেও মৃৎশিল্পের সন্ধান মেলে। মানুষ শুধু কাদামাটি দিয়ে হাতেই এমন মূর্তি গড়ে পরে রোদে শুকিয়েছে। আগুনে পুড়িয়েছে। মূর্তি স্থায়িত্ব পেয়েছে। প্রাচীনকালেই মানুষ হয়েছেন শিল্পী। সেই পুরাতনী মানুষ এমন শিল্প সাধনাকে অবলম্বন করে সভ্যতার পথে এগিয়েছে। মানুষের মানুষ হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে। মানুষ হেঁটেছে। গৃহস্থালী মাটির শিল্পে, পোড়ামাটির শিল্পে মানুষের প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যবোধ পূর্ণতা লাভ করেছে। মাটির শিল্পের অলংকরণ শিল্পীর অন্তরস্থিত সৌন্দর্য সত্তার প্রকাশ। মধ্যযুগে গ্রাম প্রতিষ্ঠার পর মৃৎশিল্প মানুষের জীবন জীবিকা অর্থনীতির বাহক। গ্রামেই ছিল কুমোরপাড়া। পল্লী কুমোরেরা শত শত বৎসর ধরে ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে মৃৎশিল্পের সৃষ্টি কৌশল আয়ত্ত করেছেন। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে আদর্শ গ্রাম সমাজ গঠনে কুমোরদের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাটি দিয়ে তৈরি সামগ্রীকে মৃৎ শিল্প বলে। বরাক উপত্যকার মৃৎশিল্পে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। কুমোর সম্প্রদায়ের মানুষেরা মাটি দিয়ে বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরি করেন যা নিত্য প্রয়োজনীয়। যেমন- কলসি, হাঁড়ি, ঘটি, শরা, কাপ, কাই, প্লেট, ঘট ইত্যাদি। এছাড়াও দেবদেবীর প্রতিমা নির্মাণে মৃৎশিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নবর্গের মানুষেরা ছিলেন

শিল্পী। কুমোর পাড়ার কুমোরেরা মাটির জিনিস তৈরি করার জন্য শুধু নিজেদের হাত এবং পরবর্তীকালে চাকার ব্যবহার করেছেন কোমরেরা। বাকি সংগ্রহ করে মাটিকে থেশে উপযুক্ত করে, হাত বা বা চাকার সাহায্যে পাত্র তৈরি করে তাকে বিভিন্ন অবয়বে সম্পূর্ণ করেন।

ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রতিমা নির্মাণের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়। সঞ্জয় রায়, রাজিব বিশ্বাসের সাক্ষাৎকারে জানা যায় খড়ের তৈরি প্রতিমার উপর মাটি লাগানোর কৌশল। বরাক উপত্যকায় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা-পার্বণ হয়। দেব দেবীর পূজাতে দেব দেবীর প্রতিমা নির্মাণ করা হয়। প্রথমত খড়ের তৈরি স্ট্রাকচারের উপর মাটির লেপন করতে হয়। খড়ের উপরে লাগানো মাটিকে ভালো করে প্রক্রিয়াজাত করতে হয়। আঠাল মাটিকে ভালো করে মেঠে (মথিত করে) মধ্যে তোষ দিয়ে মাটি ভালো করে পেস্ট করতে হয়। তারপর এই মাটি খড়ের উপর লাগানো হয়। প্রতিমার আঙুল, মুখ, তৈরি করতে আটাল মাটিকে মাঠার সময় পাট দিতে হয় যাতে মাটি ফেটে না যায়। মাটি লাগানোর পর যাতে মূর্তির শরীরে রং ভালোভাবে লাগে এবং ফেটে না যায় সেজন্য আটাল মাটি জলে ঘন করে মিলিয়ে কাপড় দিয়ে ছেকে নিতে হয়। তারপর ওই ক্রিমের মত মাটি তুলি দিয়ে মূর্তির উপরে লেপন করা হয়।

এছাড়াও প্রতিমায় চুল, অলংকার, কাপড় মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়। মৃৎ শিল্পী তার সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা এক আকর্ষণীয় দৃশ্য তৈরি করে। এমনভাবে মাটির অলংকার তৈরি করা হয় যা রং করার পর স্বর্ণা লঙ্কার মনে হয়। ডাইস দিয়ে মাটির ফুল তৈরি করে প্রতিমার কাপড়ে বসানো হয়। এছাড়াও শ্রাবণ মাসে শ্রাবণী পূজোয় মনসার ঘট নির্মাণে রয়েছে অসাধারণ কারুকার্য। নাগ দ্বারা বেষ্টিত করে ঘট তৈরি করা হয়। প্রাচীনকালে গৃহস্থালির সমস্ত বাসনপত্র মাটির তৈরি ছিল।

বরাক উপত্যকার মৃৎশিল্পের সঙ্গে অর্থনৈতিক যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের বসবাসকারী মৃৎশিল্পীরা মাটি তৈরি বাসনপত্র ও প্রতিমা বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন।

বরাক উপত্যকার কাঠশিল্প বা দারুশিল্প:

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্রের পরিসীমায় সাধারণ মানুষ একটি নৃগোষ্ঠী, জনজাতি হিসেবে জীবনধারা গড়ে। এই জীবনধারা থেকেই সংস্কৃতি রূপলাভ করে। জীবনধারার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সংস্কৃতির পরিচয় ও স্বাতন্ত্রকে সনাক্ত করে। মানুষের জীবনধারা লোকজীবনধারা-সংস্কৃতির অনুষঙ্গ, লোক ও কারুশিল্প লোকজীবনধারার অপরিহার্য অঙ্গ। লোক ও কারুশিল্প সংস্কৃতির বস্তুজাত রূপ হিসেবে লোকজীবনধারার বহুমাত্রিকতাকে ধারণ করে। এ কারণেই লোকজীবনধারার সংগে সম্পৃক্ত লোক ও কারুশিল্প কেবল শিল্পকলাই নয় বরং তা সাংস্কৃতিক এবং জাতিতাত্ত্বিক। অর্থাৎ লোক ও কারুশিল্প নৃগোষ্ঠী সম্পর্কীয়, জনজাতির শিল্পকলা বিষয়ক

সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাপনে গড়ে ওঠা লোকজীবনধারায় সৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের লোক ও কারুশিল্প একটি অঞ্চল বা অঞ্চলসমূহের মানুষের সংস্কৃতির পরিচয়কে তুলে ধরা ও সনাক্ত করার ক্ষমতা রাখে। লোক ও কারুশিল্প কোন অঞ্চল, অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রতিবেশ, মানুষ, মানুষের লোকজীবন ধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে এর তৈরি, সৃষ্টিতে কাঁচামালের চয়ন, নির্ধারণ নির্ভর করে অঞ্চলের প্রকৃতি ও পরিবেশে কাঁচামালের উৎপাদন, প্রাপ্তি ও সহজলভ্যতার উপর। লোকজীবনে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের প্রয়োজনে তৈরি লোক ও কারুশিল্প উপযোগিতার ও সৌন্দর্যের বস্তু, জিনিস। আঞ্চলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কাঁচামালের বৈশিষ্ট্য ও গুণ লোকশিল্প, বস্তুর গড়ন সৃষ্টিতে প্রভাব ফেলে। লোকজীবনধারায় চলে আসা ধর্মীয় ও লোকজবিশ্বাস, আচার-আচরণ, প্রাত্যহিকতা, গার্হস্থ্য জীবনসহ জীবনধারণের নানাদিক বিধৃত হয় লোক ও কারুশিল্পের সৃষ্টিতে। মানুষ তার অনুভব ও চেতনাকে গোষ্ঠীর চেতনায় লোকজীবনধারার উল্লিখিত উপাদানগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যময় গড়ণ, অলংকরণ ও রং-এর লোক ও কারুশিল্প সৃষ্টি করে। পরিণত হয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যময় মানুষ, নৃগোষ্ঠী, জনজাতির জীবনধারা, লোকজীবনকেন্দ্রিক সংস্কৃতির লোক ও কারুশিল্প লোক ও কারুশিল্প বস্তু, জিনিস বা গড়ন সম্পর্কীয়। লোক ও কারুশিল্প তৈরিতে প্রাকৃতিক উপাদান, কাঁচামালের প্রয়োজন হয়। লোক ও কারুশিল্পের ব্যবহারের বৈচিত্র্য ও বহুমুখীতার নিরিখে যেমন এর শ্রেণীকরণ করা যায়, তেমনি এর তৈরিতে প্রাকৃতিক উপাদান বা কাঁচামালের ব্যবহারের নিরিখে শ্রেণীকরণের মাধ্যমে লোক ও দারুশিল্পের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা যায়।

বরাক উপত্যকা তথা বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্প দারুশিল্প। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক বাংলাদেশে কাঠ শিল্পের সঙ্গে অনেক সম্প্রদায় যুক্ত ছিলেন। কাঠুরিয়া, করাতি চুতোর, কাষ্ঠভাস্কর, খোদাইকর এবং লেপ চিত্রাঙ্কন শিল্পীরা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। ছুতোরেরা ছিলেন নিম্নবর্গীয় ব্রাত্য হিন্দু সম্প্রদায়। মহাভারতের কর্ণ ছিলেন সূতপুত্র। সেকালের ছুতোরেরা কাঠের রথ তৈরি করতেন এবং রথের সারথীও হতেন। মধ্যযুগে নৌকা প্রস্তুত করতেন এরা। মধ্যযুগের নৌশিল্প শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতির চিহ্ন বহন করে। মধ্যযুগের দারুশিল্পীরা তাদের শিল্পকাজে চিরন্তন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগে গ্রাম বাংলার অর্থনীতি ব্যাঙ্ক নির্ভর ছিল না। গ্রাম-পল্লীর অর্থনীতি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, সরল। সে কারণে একালের শেয়ার মার্কেটের মত ছিল না সেকালের অর্থনীতি। লোকসমাজে সামাজিক বন্ধনের দৃঢ়তা ছিল লোকশিল্প। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে ধান উৎপাদনের উপর পণ্যের দাম ওঠানামা করত। দারুশিল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর কাঠের প্রয়োজন হত। পল্লী গৃহস্থেরা আসবাবের জন্য এমন কাঠের গাছ লাগাতেন। ছুতোরেরা কাঠের আসবাব তৈরি করতেন। নৌকা, রথ প্রভৃতি বহুমূল্য লোকশিল্প সাধারণত বণিক ও অভিজাতরা তৈরি করাতেন। প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটেছে বাংলার দারুশিল্পে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ দারুশিল্পগুলি হল নৌকা, দরজা, খাট, পালঙ্ক, সিংহাসন, কাঠের আসন, পিঁড়ি প্রভৃতি। ছুতোরেরা কাঠের দরজা তৈরির সময় শুভাশুভবোধ এবং সামাজিক রীতিনীতিকে মান্যতা দেন। হিন্দুশাস্ত্র মতে, পালঙ্ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার মেনে চলতে হয়। বাবা অথবা মায়ের মৃত্যু হলে সেই বৎসর পালঙ্ক ব্যবহার করা হয় না। নৌকা, রথ এবং সিংহাসন তৈরির ক্ষেত্রে শিল্পীরা হিন্দু পুরাণ, দেববাদ এবং মিথের সাহায্য অনুসারী হয়ে ওঠেন।

অন্যান্য শিল্পের মতো বরাক উপত্যকায় কাঠশিল্পও বিদ্যমান। বরাক উপত্যকায় দারু শিল্প তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের কাঠ পাওয়া যায়। আম কাঁঠাল, শিমুল, ছাতনী, নিম, মরই, জাম, চায়, শাল, গামারি, সেগুন, হেঙলা, কদম, গাছের কাঠ পাওয়া যায়। বরাক উপত্যকায় সূত্রধর সম্প্রদায়ের মানুষ কাঠ দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বিভিন্ন কারুকার্যের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তুলে। যেমন- চেয়ার, টেবিল, পালং, আলমারি, ঘর-বাড়ি, মূর্তি ইত্যাদি।

ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে জানা যায় শাল, সেগুন, চাম ইত্যাদি কাঠে খুব ভালো চেয়ার, টেবিল, পালং, ড্রেসিং টেবিল, আলনা প্রভৃতি তৈরি করা যায়। পালঙ্ক তৈরি করতে সূত্রধরেরা বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য করেন। পালঙ্কের বোর্ডে নানান ধরনের ডিজাইন করে। ফুল, পাখি অনেক নতুন ধরনের আকৃতি করে থাকেন। আগেকার দিনে বরাক উপত্যকার সূত্রধরেরা হাত দিয়ে পালঙ্কের ফুল খোদাই করতো। আধুনিক যুগে বিভিন্ন যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে সূত্রধরের কষ্ট লাঘব হয়েছে। পালঙ্ক বিভিন্ন দামে বাজারে বিক্রি হয়। শিল্পীরা পালঙ্কের ফুলের উপর বার্নিশ লাগিয়ে খুব আকর্ষণীয় করে তোলেন।

পালঙ্ক চেয়ার, টেবিল ছাড়াও কাঠ দিয়ে খোদাই করে বিভিন্ন ধরনের মূর্তি তৈরি করা হয়। পাখি, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি কাঠ দিয়ে তৈরি করে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন কাষ্ঠশিল্পীরা। কাঠ দিয়ে তৈরি করা দেব-দেবীর মূর্তিগুলো খুব চমৎকার হয়। কাঠের টুকরোতে খোদাই করে শিল্পীরা দেবতার মূর্তি তৈরি করেন। এছাড়াও ঘরে সৌন্দর্য প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাঠ দিয়ে খেলনা তৈরি করা হয়। প্রাচীনকালে কাঠের হাতা কুন্তিও ছিল। বরাক উপত্যকায় আকড়াতে কাঠ দিয়ে তৈরি মহাপ্রভুর রথ খুব আকর্ষণীয়। কাষ্ঠ শিল্পীরা তাদের চিন্তাধারা দিয়ে নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টি করে এগিয়ে যাচ্ছেন।

বরাক উপত্যকার বয়ন শিল্প:

এই বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাসমূহ যেসব অঞ্চলে বিকাশ লাভ করেছিল তার মধ্যে মিসরের নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চল, ভারতীয় উপমহাদেশ, পেরু, চীন এবং মেসোপটেমিয়া অঞ্চল অন্যতম। প্রতিটি অঞ্চলে এক একটি সুনির্দিষ্ট রূপ ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এসব অঞ্চলে গড়ে ওঠা প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও গড়ন বিশ্বসভ্যতার পরিমণ্ডলকে করেছে মহান, ঐশ্বর্যময় এবং তাৎপর্যপূর্ণ। উল্লিখিত অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতাসমূহের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আজকের আধুনিক জীবনযাত্রায়, আধুনিক মানুষের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড, সর্বপরি সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রতিনিয়ত প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। প্রাচীন সভ্যতার নানা উপাদান, উপকরণ এখনো আমাদের জীবনে সক্রিয়, প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর। এমন কিছু উপাদান, উপকরণ রয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিত এতটুকু বদলায়নি বলা যায়,

অপরিবর্তিত। এক একটি প্রাচীন সভ্যতা আমাদের দিয়েছে মানুষের অনুভব, মনন, চিৎপ্রকর্ষ, সৌন্দর্যবোধ, কারিগরি ও প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক চেতনাসমৃদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত রত্নসম অমূল্য সম্পদ।

প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতা বিশ্বের এক একটি অঞ্চলে নিজ নিজ ভৌগোলিক- প্রাকৃতিক পরিবেশে ঐ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নৃগোষ্ঠী কর্তৃক সৃজিত, লালিত, বিকশিত ও রূপলাভ করেছিল। এক একটি প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য স্থির হয়েছিল ঐসব প্রাচীন সভ্যতার সংগে সম্পৃক্ত অঞ্চলের ভৌগলিক আবহাওয়া, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ থেকে প্রাপ্ত উপাদান কাঁচামাল দ্বারা। কাঁচামাল বা উপকরণ অনিবার্যভাবে সৃষ্টি করেছে, সৃষ্টির পথ প্রশস্থ করেছে প্রাচীন সভ্যতাসমূহের অন্তর্গত আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা কর্মকান্ড। এভাবেই প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, রূপ প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন সভ্যতাসমূহের বৈশিষ্ট্য-চিরায়ত বৈশিষ্ট। সেজন্য আজকের আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনেও তা ক্রিয়াশীল।

বস্ত্র মানুষের ন্যূনতম চাহিদার একটি। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বস্ত্র-বয়নশিল্প এক বিরাট মাইল ফলক। বস্ত্র-বয়নশিল্প বস্তুত সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত। বিশ্বের সকল সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এর একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যময় ভূমিকা রয়েছে। এজন্যই বয়নশিল্পে রয়েছে বহুমাত্রিকতা। প্রত্নতত্ত্বের সংগে এর সম্পৃক্ততা রয়েছে। আদিম, প্রাচীন মানুষের বস্তুজাত সংস্কৃতির রূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্মাণে বস্ত্র-বয়নশিল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বয়নশিল্পের সংগে সম্পর্কিত নানা বৈচিত্রময় মোটিফ, নকশা পর্যালোচনায় সে সব রহস্য উদ্ধার, আবিষ্কৃত হবে। তা মানুষের জীবন, ধর্ম ও সমাজের আচার অনুষ্ঠানের নানা সাংকেতিক দিককে উদঘাটন করবে। আর্থ-সামাজিক দিক তো রয়েছেই। শৈল্পিক বিশ্লেষণও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

যে শিল্প বয়ন বা বাইন করে সৃষ্টি করা হয় তাকে বয়নশিল্প বলে। বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলার কালিগঞ্জ অঞ্চলটি শীতল পাটির জন্য বিখ্যাত। বিভিন্ন প্রকার বয়ন শিল্প যেমন পাটি, বেতের তৈরি ফুল,আয়নার ফ্রেম, ফুলের সাজি, পটাঙ্গি, টুকরি, বেড়া,ডাম, দাড়িয়া ইত্যাদি। এছাড়াও মণিপুরিদের মধ্যে রয়েছে গামছা বয়নের নানা কারুকার্য। বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলার কালিগঞ্জ অঞ্চল বয়ন শিল্পের জন্য বিখ্যাত। কালিগঞ্জের শিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের পাটি তৈরি করেন। শীতল পাটি, নকশী পাটি, চাটি ইত্যাদি তৈরিতে কালিগঞ্জের নাম সমস্ত বরাক তথা বরাকের বাইরে ছড়িয়ে আছে।

বরাক উপত্যকার কালিগঞ্জের শিল্পীরা মুরতা বেত দিয়ে বয়ন করে পাটি তৈরি করে। মুরতা হল একধরনের তৃণশ্রেণির উদ্ভিদ। মুরতা কেটে বেত বের করে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাটি তৈরির উপযোগী করে তুলে। শীতল পাটি ভালো আরামদায়ক করে তুলতে মুরতা বেত কে প্রথমে সেদ্ধ করে রোদে শুকিয়ে বয়ন করেন। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় রঙ্গিন পাটি তৈরি করতে মুরতা বেতকে প্রথমে মেঝেট দিয়ে রং করে তারপর বয়ন করতে হয়। শীতল পাটি, নকশা পাটিতে নানা নকশার দ্বারা আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। গ্রামীন দরিদ্র শিল্পীদের পাটি তৈরীর শিল্প দেখে মনে হয় শিল্পীরা অনেক বুদ্ধি নিয়ে জন্ম নিয়েছেন। তারা উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রযুক্তি পেলে অসাধারণ কোনো শিল্প তৈরি করতে সক্ষম হতেন। চাটি বয়ন করতে মুরতা বেত পাটির তুলনায় একটু বড় হয়। পাটি বিক্রি করে কালিগঞ্জ অঞ্চলের বয়ন শিল্পীরা তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন। জানা যায় একটি পাটি শাত'শ টাকা থেকে শুরু করে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। পাটি তৈরী কারীরা গ্রাম থেকে মুরতা কিনে পাটি তৈরি করে। গ্রামেগঞ্জে ফেরি করি বয়ন শিল্পীরা পাটি বিক্রি করেন।

প্লাস্টিকের পাত্র বের হওয়ার আগে বরাক উপত্যকার প্রতিটি ঘরে পটাঙ্গি ব্যবহৃত হতো। পটাঙ্গি বাঁশ দিয়ে তৈরি একটি আকর্ষণীয় সামগ্রী। লোকশিল্পের বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে পটাঙ্গি অন্যতম প্রয়োজনীয় সামগ্রী। পটাঙ্গি তৈরি করতে মিরতিঙ্গা, বেঁথু ইত্যাদি বাঁশের প্রয়োজন হয়। নির্দিষ্ট মাপে বাঁশ কেটে তার থেকে বেত বের করে বয়ন করে পটাঙ্গি তৈরি করা হয়। পটাঙ্গি তৈরি করতে বাঁশের বেতকে নমনীয় করতে হয়। পটাংগি তলা, পাশ, ওপরের মোড়া বাঁধুনি বুনন এর বৈচিত্র। নীচ থেকে বয়ন করে ধীরে ধীরে উপরের দিকে তুলতে হয়। পটাঙ্গির তলদেশ চতুষ্কোণ উপরের অংশ ধীরে ধীরে গোলাকার করে তোলা হয়। বাঁশ টুকরো করে চেঁছে নমনীয় করে বিভিন্ন ডিজাইনের টুকরি তৈরি করেন লোকশিল্পীরা। পটাঙ্গির নকশা চমৎকার সৌন্দর্যের দ্যোতক। প্রকারের ভিন্নতা ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার সূত্রে শিল্পীরা লাভ করেন। বিশেষত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই পটাঙ্গি তৈরি করে।

বয়নশিল্প শুধু দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাকে না ।বিশেষ সৌখিন মানুষের বিনোদনের সময়ে নতুন চিন্তাধারায় নতুন নতুন বয়নশিল্প তৈরি হয়। বিশেষ সৌখিন বা সাংস্কৃতিক পরিবারে বাঁশের বেত দিয়ে বয়ন করে তৈরি আয়নার ফ্রেম দেখা যায়। বাঁশের বেতের ফ্রেমযুক্ত আয়না বিশেষত বিভিন্ন মেলায় পাওয়া যায়। যেমন বদরপুরের বারুণী মেলা, করিমগঞ্জের নেতাজি মেলা, পৌষ সংক্রান্তিতে পীন্নঘরে পৌষ সংক্রান্তি মেলা , হাইলাকান্দিতে আনন্দ মেলা,পৌষ মেলা, রবীন্দ্র মেলা, দীঘলবাকে পৌষ সংক্রান্তি মেলা। ক্ষেত্র সমীক্ষা অনুযায়ী জানা যায় আয়নার ফ্রেম তৈরি করতে ছোট ছোট বাঁশের টুকরো নানা ডিজাইন করে কেটে, পরে বয়ন করে এগুলো তৈরি করা হয়। তারপর বিভিন্ন ধরনের রং, চুমকি লাগিয়ে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। বাঁশের ফ্রেমযুক্ত আয়না বাজারে বেশি মূল্যে বিক্রি হয়।

বাঁশের বেত দিয়ে তৈরি কলমদানি কলম রাখতে ব্যবহৃত হয়। ছোট বাঁশের টুকরোর আঁশ ফেলে ছোট ছোট বেত বের করে বয়ন করা হয়। কলমদানি বিভিন্ন ডিজাইনে তৈরি করা হয়। রং করে কলম দানি বিশেষ আকর্ষণীয় হয় ও টেবিলের শোভা বর্ধন করে। কলমদানি বিভিন্ন মেলায় বিক্রি হতে দেখা যায়। বিনোদনের জন্য বা সৌন্দর্যের জন্য বয়ন শিল্প আকর্ষণীয় হয়। সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে ঘরে টেবিলের উপরে ফুলদানি রাখা হয়। বাঁশের তৈরি ফুলদানি খুব আকর্ষণীয় হয়। ফুলদানি কলমদানির মতো বাঁশকে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা হয়। ফুলদানি বিভিন্ন মেলায় বিক্রি হতে দেখা যায়।

ফুলের সাজি বিশেষত ফুল তুলতে ব্যবহৃত হয়। ফুলের সাজি বিভিন্ন রকম তৈরি করা যায়। নিত্য দিনের পূজায় বা বিশেষ পূজা পার্বণে ফুলের সাজি দিয়ে ফুল তোলা হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়। বাঁশ থেকে বেত বের করে তারপর বয়ন করে ফুলের সাজি তৈরি করা হয়।

বরাক উপত্যকার অন্যতম আকর্ষণীয় বয়ন শিল্প ডালা। ডালা বাঁশ দিয়ে তৈরি অন্যতম একটি সামগ্রী। গ্রাম শহর সব জায়গাতেই প্রত্যেক পরিবারে ডালার ব্যবহার আছে। চাল, মরিচ, শুটকি, আমসত্ত্ব প্রবৃত্তি শুকাতে ব্যবহৃত হয়। ডালা কৃষি কাজেও ব্যবহৃত হয়। কুলার মত ডালা দিয়েও ধানের কাটা সরানো হয়। বরাক উপত্যকার, করিমগঞ্জ জেলার ইছাবিল অঞ্চলের মানুষেরা ডালা দিয়ে দানের কাটা সরায়। ডালা ধান তোলার সময় বাজারে বেশি পরিমাণে বিক্রি হয়। ডালা তৈরি করতে প্রথমে বাঁশ থেকে আঁশ ফেলে তারপর বয়ন করে তৈরি করা হয়। ডালা গোলাকার হয়। সেজন্য ডালাতে গোল চাকের প্রয়োজন হয়। বয়ন করার পর চাকের সঙ্গে সুতো দিয়ে ভালো করে বেঁধে দেয়া হয়। ঢালা তৈরির পর গোবরের লেপন করা হয়।

গৃহকার্য কৃষিকার্য ছাড়াও ঢালা ব্যবহৃত হয় বিয়ে অন্নপ্রাশন ইত্যাদি শুভ অনুষ্ঠানে। বিয়ের সময় ডালাতে রঙের দ্বারা সাজিয়ে নানান দ্রব্যাদি রাখা হয়। এছাড়াও কোন অনুষ্ঠানে বা পূজোর প্যান্ডেলে ছোট বড় ডালা দিয়ে সাজানো হয়। কখনো ডালার উপর স্টিকার বা কাগজের ছবি লাগিয়ে দেয়ালে লাগানো হয়। মহিলাদের মৃত্যুর পর শ্মশানেও ডালা কুলা কলসি প্রভৃতি দেয়া হয়। ডালা বরাক উপত্যকা তথা সমগ্র বাংলাদেশে মানুষের সঙ্গে ও ওতোপ্রতভাবে ভাবে জড়িয়ে আছে। এছাড়াও বয়ান করে তৈরি করা হয় ডাম, দাঁড়া প্রভৃতি। বরাক উপত্যকায় বস-বাসকারী মণিপুরি মানুষেরা সুতো দিয়ে গামছা কাপড় ইত্যাদি তৈরি করে। সুতা দিয়ে বরণ করে অসাধারণ এক মনোরম গামছা তৈরি করে। তা 'মনিপুরী গামছা' নামে বরাক উপত্যকায় বিখ্যাত হয়ে আছে।

উপসংহার: উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় অন্যান্য অঞ্চলের মতো বরাক উপত্যকার লোকশিল্পও বৈচিত্রপূর্ণ। বরাক উপত্যকার লোকমানস থেকে সৃষ্ট শিল্প গুলো নানা কারুকার্যে সমৃদ্ধ। বাঁশ, বেত, কাঠ, পাঠ, কড় মাটি ইত্যাদি দিয়ে মানুষ অসাধারণ সামগ্রী তৈরি করে। যে সামগ্রীগুলো মানব জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বরাক উপত্যকার লোকশিল্প গুলো বর্তমানে হারিয়ে যাচ্ছে। প্রাচীনকালে মানুষ সাধারণ উপাদান দিয়ে যে সমস্ত শিল্প তৈরি করত তা আজও আকর্ষণ করে। বৈচিত্রপূর্ণ বরাক উপত্যকায় বিভিন্ন জাতি জনজাতির মধ্যে প্রচলিত শিল্প গুলো জীবন ও জীবিকার বাহক ছিল। বর্তমানে মৃৎশিল্প, কাঠ শিল্প ছাড়া বাকি শিল্প গুলোর অস্তিত্ব প্রায় সংকটের মুখোমুখি। আর কিছু কিছু শিল্প সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে কালের স্রোতে। আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রভাবে ও আলস্য প্রিয়তার জন্য বাঁশের তৈরি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো আজ আর নেই। আগে যেখানে বাঁশের তৈরি সামগ্রীগুলো নিত্যদিন ব্যবহৃত হতো সেই সামগ্রীগুলোর স্থান দখল করেছে প্লাস্টিক, অ্যালুমিনিয়াম ও স্টিল

জাতীয় শিল্প। কাঠশিল্পতেও দেখা যায়, লোহা ও স্টিলের পালং, চেয়ার ইত্যাদির প্রচলন। বয়ন শিল্পে চলে এসেছে নানান আধুনিক যন্ত্রপাতি। বরাক উপত্যকায় এক সময়ে লোকশিল্পীরা এই শিল্প গুলো তৈরি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। লোকশিল্প গুলো ক্ষতিকারক না হলেও এগুলো তৈরি করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন।সেজন্য মেশিন দিয়ে তৈরি সামগ্রীগুলো এখন বেশি প্রচলিত। বরাক উপত্যকায় বৈচিত্রপূর্ণ লোকশিল্প আজ আর কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে। ছুতার সূত্রধর, কুমার, আজ আর দেখা যায় না। কিন্তু বর্তমানকালে ঘরের শোভা বৃদ্ধি করতে ঘর কে আকর্ষণীয় করে তুলতে ঘরের মধ্যে বাঁশবেতের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী ব্যবহার করতে দেখা যায়। আমাদের সকলের একাগ্রতায় লোকশিল্পকে টিকিয়ে রাখা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে বলে আশা রাখছি।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণ কুমার। বাংলার লোকশিল্প। সুকুমার চৌধুরী প্রকাশক, পুরোগ্রামী প্রকাশনী, কলকাতা।
২. হাসান, ড: সৈয়দ মাহমুদূল। বাংলাদেশের লোকশিল্প। প্রেসিডেন্সি প্রিন্টিং ওয়ার্কস,৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১।
৩. আলম, সৈয়দ মাহবুব। লুকোশিল্প। প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৯, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন।

তথ্যদাতা:

১. চিত্তরঞ্জন রায়। গ্রাম: কাটাগ্রাম, পো: গিরিশগঞ্জ বাজার, জেলা: করিমগঞ্জ।
২. সুজিত রায়। গ্রাম: জারোইল বাড়ি, জেলা: করিমগঞ্জ।
৩. বাদল কান্তি রায়। গ্রাম: কাটাগ্রাম, পো: গিরিশগঞ্জ বাজার, জেলা: করিমগঞ্জ।
৪. আচ্ছাধন রায়। গ্রাম: কাটাগ্রাম, পো: গিরিশগঞ্জ বাজার, জেলা: করিমগঞ্জ।
৫. শান্তি রায়। গ্রাম: কাটাগ্রাম, পো: গিরিশগঞ্জ বাজার, জেলা: করিমগঞ্জ।
৬. সঞ্জয় রায়। গ্রাম: কাটাগ্রাম, পো: গিরিশগঞ্জ বাজার, জেলা: করিমগঞ্জ।
৭. রাজীব বিশ্বাস। গ্রাম: নাথুপুর, পো: গিরিশগঞ্জ বাজার, জেলা: করিমগঞ্জ।
৮. রাজু নমঃশূদ্র। গ্রাম: নাথুপুর, পো: গিরিশগঞ্জ বাজার, জেলা: করিমগঞ্জ।
৯. অতীন্দ্র সূত্রধর। গ্রাম: ছোরাদিঘিরপার, পো: গিরিশগঞ্জ বাজার, জেলা: করিমগঞ্জ।
১০. পঙ্কজ নমঃশূদ্র। গ্রাম: পদ্মার পার, পো: গিরিশগঞ্জ বাজার, জেলা: করিমগঞ্জ।
১১. রজত রায়। গ্রাম: পদ্মার পার, পো: গিরিশগঞ্জ বাজার, জেলা: করিমগঞ্জ।
১২. কাজল রায়। গ্রাম: কাটাগ্রাম, পো: গিরিশগঞ্জ বাজার, জেলা: করিমগঞ্জ।
১৩. সফিকুল ইসলাম চৌধুরী। লালা, হাইলাকান্দি।
১৪. প্রণোজয় রায়। গ্রাম: কাটাগ্রাম, পো: গিরিশগঞ্জ বাজার, জেলা: করিমগঞ্জ।
১৫. গোবিন্দ রায়। গ্রাম: কাটাগ্রাম, পো: গিরিশগঞ্জ বাজার, জেলা: করিমগঞ্জ।
১৬. হীমাবতী রায়। গ্রাম: কাটাগ্রাম, পো: গিরিশগঞ্জ বাজার, জেলা: করিমগঞ্জ।
১৭. হীমানী রায়। গ্রাম: কাটাগ্রাম, পো: গিরিশগঞ্জ বাজার, জেলা: করিমগঞ্জ।